Doya Tobo Doya by Moti Nondi

For More Books Visit www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

দয়া, তব দয়া

মতি নন্দী

অরবিন্দের বাবা-মা যখন ট্রেন দুর্ঘটনায় মারা গেলেন তখন সে হাজারিবাগের কাছাকাছি একটি মিশনারী আবাসিক স্কুলের ছাত্র। ওর বাবা ছিলেন ভারত কনস্ট্রাকশন নামে এক ঠিকাদারী সংস্থার এঞ্জিনিয়ার। সারা ভারত ঘুরে ঘুরে ব্রিজ, বাঁধ, টানেল ইত্যাদি তৈরীর কাজে নিযুক্ত থাকায় ছেলেকেও বাবার সঙ্গে ঘুরতে হচ্ছিল। লেখাপড়া তার ফলে এগোচ্ছে না দেখে তিনি স্থির করলেন ছেলেকে কোন বোর্ডিংয়ে রাখবেন। লাহোর থেকে পুনা এবং সেখান থেকে সেরাইকিলা হয়ে জাহাজের ইয়ার্ড তৈরী কাজে বিশাখাপত্তমে আসার আগেই তিনি ছেলেকে বিহারের এই বোর্ডিং স্কুলে রেখে যান।

বয়স অনুযায়ী অরবিন্দের লেখাপড়ার ভিতটি মজবুত ছিল না, তাই দু'ক্লাস নীচেই তাকে ভর্তি করা হয়। বয়সে ছোট ক্লাসের ছেলেদের সঙ্গে সে নিজেকে খাপ খাওয়াতে অসুবিধা বোধ করে গুটিয়ে থাকত। অরবিন্দ ক্ষীণদেহী, লম্বাটে মুখ। গায়ের রং তামাটে। সুদর্শন বলতে যা বোঝায় মোটেই তা নয়। তবে বেঢপ বেমানান কিছু তার অবয়বে নেই। নাকটি টিকালো। মোটা কালো ফ্রেমের চশমা এবং আঁচড়ালেও ব্রহ্মতালুর কাছে খাড়া হয়ে থাকা একগুচ্ছ অবাধ্য চুল ও চওড়া হাঁ-মুখের জন্য ওকে খানিকটা হাস্যকর দেখাত। কেউ কেউ বলতো 'ডোনাল্ড ডাক।'

অরবিন্দের মধ্যে আকর্ষণীয় বলতে যেটি, তা হল ওর কণ্ঠস্বর। আর শান্ত সহৃদয় আচরণ এবং পরিহাসপ্রিয়তা। ওর কণ্ঠস্বর ঘন গভীর গমগমে। অনেকটা খাদে দেবব্রত বিশ্বাসের গলার মত। কথা বলে যেন ভেবে-চিন্তে ধীরে ধীরে।

বোর্ডিংয়ে সাধারণত যা হয়ে থাকে, ছেলেরা উত্ত্যক্ত করার পাত্র খোঁজে এবং পেয়েও যায়। অরবিন্দ প্রথম যখন আসে তখন ওকেই তারা পেয়েছিল। রোগা চেহারা, খাড়া টিকির মত চুল। ব্যাঙের আদলে মুখ এবং মোটা ফ্রেমের চশমা ইত্যাদি মিলিয়ে সে লাঞ্ছনার শিকার হয়ে পড়ে। বহুদিন সে ছুটির পর স্কুলঘরে একা বসে থেকেছে, বাইরে অপেক্ষমাণ ছেলেদের ভয়ে। বছরখানেকের মধ্যেই ছেলেরা ওকে রেহাই দেয় প্রধানত ওর মৃদু এবং মিষ্টি স্বভাবের জন্য।

টেনিস কোর্টের ধারে সে কখনো যায়নি, হকি বা ফুটবল খেলা দেখত দূর থেকে। আদিবাসীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিল ধনুক আর লোহার ফলা লাগানো দুটি তীর। তাই নিয়ে বিকেলে সে ঘুরে বেড়াত। কাছাকাছি টিলায়, ঝোপে কিংবা লরিচলার রাস্তা ধরে চলে যেত বহু দূরে।

হত্যায় বিরাগ ছিল অরবিন্দর। একটা অদ্ভুত ব্যাপার ওর চরিত্রে আছে। শিকারী টিকটিকি গুঁড়ি দিয়ে অন্যমনস্ক আরশুলার দিকে এগোচ্ছে দেখে একদিন সে হাতের কাছে পাওয়া বইটা ছুঁড়ে আরশুলাটাকে হুঁশিয়ার করে দেয়। বইটি ছিল ওর সহপাঠি এবং একই ঘরের বাসিন্দা চিররঞ্জনের, যাকে সে চিরো বলে ডাকে। চিরো ছাড়া আজ পর্যন্ত আর কেউ তার দ্বিতীয় বন্ধু নেই। বইটার সেলাই ছিঁড়ে, পাতাগুলি আলাদা হয়ে গেছিল। বারবার ক্ষমা চেয়ে অরবিন্দ বলে, 'মরাটাতো কোন ব্যাপার নয়, কিভাবে মরছে, কেমনভাবে মরছে সেটাই হল আসল কথা। টিকটিকিটার মুখের মধ্যে আধখানা ধড় ঢোকান আরশুলাটা ছটফট করবে আর একটু একটু করে ভিতরে ঢুকবে, এটা অসহ্য।'

বোর্ডিংয়ের উচ্ছিষ্টে পালিত গুটিদশেক কুকুরের মধ্যে একটির পিছনের পায়ের উপর দিয়ে একদিন লরি চলে

যায়। নিজেকে হিঁচড়ে পথের ধারে এনে কুকুরটি করুণ আর্তনাদ করতে থাকে। তখন স্কুল চলছিল। ক্লাস ঘর থেকে অরবিন্দ ঘটনাটি ঘটতে দেখেই চিৎকার করে উঠে দু'হাতে চোখ ঢাকে, তারপর ছুটে বেরিয়ে যায়।

রাত্রে সে চিরোকে বলে, 'কুকুরটা মরে গেলে আমার কিছুই হতো না, কিন্তু ওই যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে মরা।' একবার ককুরগুলোর একটা পাগল হয়ে একটি ছেলেকে কামড়িয়ে ছুটোছুটি শুরু করে। অরবিন্দ তীর-ধনুক নিয়ে বেরিয়ে মিনিট তিনেকের মধ্যে, যাওয়ার মতই স্বাভাবিক মুখ নিয়ে ফিরে আসে। একটি তীরেই কুকুরটির গলা সে ফুঁড়ে দিয়েছিল। কখনোই সে দীর্ঘ সময় নিয়ে দ্বিধাভরে তীর ছুঁড়তো না। তার কাছে যুক্তিসঙ্গত মনে হলেই ধনুকের ছিলে টানতো এবং হত্যার জন্যই। তার চরিত্রের গভীরে মমতা ও ক্রুরতা অচঞ্চলভাবে থেকেছে, একে অপরকে না খুঁচিয়ে।

এখানেই ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং অল্পদিনেই অন্তরঙ্গতা হয় চিররঞ্জনের। বয়সে অরবিন্দের থেকে এক বছরের ছোট, হকি এবং ফুটবলে দক্ষ, এই ছেলেটি মেজাজে ও আচরণে কিঞ্চিৎ বিস্ফোরক। চলনে ও বাচনে যতটা সপ্রতিভ, পড়াশুনায় তার অর্ধেকও নয়। চোখা নাক-মুখ, ঘন অবিন্যস্ত একরাশ চুল, সাজানো ঝকঝকে দাঁত– এসবই সাধারণ হয়ে যেত যদি না ওর গায়ের রঙ চা-এর ঘন লিকারের মতো হতো। বিপক্ষের হকিস্টিক ওর কপালে ও চিবুকে যে আঁচড়গুলি রেখে গেছে, অকারণ-হাসিতে সেগুলি যখন নড়াচড়া করে, যে কোন অনুভূতিপ্রবণের পক্ষেই তখন শিহরণের আলতো ছোঁয়া এড়ানো কঠিন হয়ে পড়ে। চিরোর বাবা কলকাতায় বিরাট এক প্রেসের মালিক। সরকারী কাজগুলি একচেটিয়া তারই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সংগৃহীত বিপুল পরিমাণ অর্থ তাকে ব্যবসাটিকে বড়ো করে তুলতে উদ্যোগী করে। স্থির করেন নতুন নতুন মেশিন বিদেশ থেকে আনিয়ে প্রেসটিকে আধুনিক করবেন ও পত্রপত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হবেন। চিরোকে ইউরোপে কাজ শিখতে পাঠাবেন ভেবে প্রথমে পাঠান এই বোর্ডিং স্কুলে, ইংরেজী শেখার জন্য।

অরবিন্দের আত্মীয়-স্বজন সংখ্যায় যথেষ্ট থাকলেও যোগাযোগ ছিল একমাত্র তার রাঙাপিসি তুষারকণা ও কনেপিসি হিমকনার সঙ্গে। ওরা দুজনই তার বাবার খুড়তুতো বোন। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়সী রাঙাপিসি বিধবা, নিঃসন্তান এবং গুটি আষ্টেক বেড়ালসহ তালতলায় একটি বাড়ি, দু'ঘর ভাড়াটে ও কিছু কোম্পানীর কাগজের মালিক। একক জীবন স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে যাবার পক্ষে যথেষ্ট। কনেপিসি একটি স্কুলে ভূগোল ও বাংলা পড়ান। চল্লিশ স্পর্শ করামাত্রই বিয়ে করেছেন। স্বামীসহ দিদির বাড়িতেই থাকেন। কনেপিসেমশাই, শোনা যায় রাজশাহীর এক জমিদার পরিবারের বংশধর। একটি সেতার ছাড়া তার ব্যক্তিগত আর কোন সম্পত্তি নেই। প্রতিদিন ঘণ্টা চারেক রেওয়াজ ছাড়া এমন আর কিছু করেন না, যাতে অর্থাগম হতে পারে। মৃদুভাষী মানুষটি সারাদিন স্ত্রীর সঙ্গে চার-পাঁচটির বেশি বাক্য বিনিময় করেন না। শোনা যায়, বিমাতাপুত্ররা চক্রান্ত করে তাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছে।

বাবা-মা মারা যাওয়ার পর অরবিন্দ বোর্ডিং ছেড়ে তালতলায় রাঙাপিসির বাড়িতে আশ্রয় পায়। সদ্য গড়ে ওঠা কলকাতার দক্ষিণ শহরতলীতে তিনকাঠা জমি এবং হাজার পনেরো টাকা ক্যাশ সার্টিফিকেট ছাড়া বাবা আর কিছু রেখে যাননি। পিসির বাড়ির চালচলন ও চিন্তাভাবনা একটু অদ্ভুত ধরনের। তার মত নিঃসঙ্গ এবং অনুভূতিপ্রবণ ছেলে এমন এক বয়সে এখানে এসে পড়ে যখন বাইরের জগত মনের উপর গভীর ও স্থায়ী ছাপ ফেলতে শুরু করেছে। জীবনমাত্রেই ভালবাসা চায়। এমনকি গাছপালাও সূর্যরশ্মির তপ্ত আদর পাবার জন্য ঊর্ধ্বে শাখা মেলে। অন্যদের থেকে এটা বেশী দরকার হয় শিশু ও কিশোরদের। নিরাপদ আশ্রয়ের নিশ্চিন্ত দরকারী বটে কিন্তু ভালবাসা বা আদরের প্রয়োজনকে তা মেটাতে পারে না। এর জন্য অরবিন্দের মনে যে প্রবল তৃষ্ণা, তা পিসিদের আলগা নিরুত্তাপ স্নেহ মেটাতে পারেনি। পরবর্তী জীবনে ভালবাসা পাবার জন্য যে আকুতি ওর মধ্যে দেখা দেয়, তার কারণ, সম্ভবত বাল্যজীবনের এই অভাবটুকু।

তালতলা বাড়ির মালিক যদিও রাঙাপিসি কিন্তু তিনি থাকতেন একতলায় অরবিন্দ ও বেড়ালদের নিয়ে। বেড়ালগুলির কারুর রঙ কালো, অথবা খয়েরি কিংবা সাদা। দু-তিনটির দেহে নানাবিধ রঙের সম্মিলন থেকে অনুমান করা যায় এদের পূর্বপুরুষদের চিত্ত কত প্রশস্ত ছিল। বাড়ির সেরা দোতলায় দক্ষিণ-পূর্বের ঘরটিতে থাকতেন কনেপিসিরা। সারা বাড়িতে একমাত্র এই ঘরটার দেয়ালেই সেতারের শব্দতরঙ্গ সুরের বিশুদ্ধতা বজায় রেখে নাকি প্রতিধ্বনিত হয়, কনেপিসির এই যুক্তির বিরুদ্ধে তার স্নেহপ্রবণ সহজেই আত্মসমর্পণ করেছিলেন। দোতলায় পিছনের অংশে ভাড়াটে ছিল এক জীবনবীমার দালাল ও তার স্ত্রী এবং তিনতলায় এক

For More Books Visit www.MurchOna.com

অধ্যাপক দম্পতি। ভাড়াটেরা দুই বোনকে এড়িয়ে চলতো।

দিদির বাড়ীতে কনেপিসি তার স্বামীকে নিয়ে থাকতেন বিনাভাড়ায়। 'স্বামীকে নিয়ে' বলাই যুক্তিযুক্ত, কেননা স্ত্রীকে নিয়ে থাকার মত সাহস ও ব্যক্তিত্ব ভদ্রলোকের ছিল না। বাড়ির ট্যাক্স বা ইলেকট্রিক বিলের অংশ বহনের মত সামান্য ব্যাপারেও কনেপিসি মাথা ঘামাতেন না। এর কারণ, তিনি বিশ্বাস করতেন, অদূর ভবিষ্যতে তার স্বামী জমিদারির মালিক হবেন এবং বাকি জীবনটা তারা সবাইকে নিয়ে সুখে কাটিয়ে দেবেন। এই বিশ্বাসটি তিনি বড়বোনের মধ্যেও সঞ্চার করতে পেরেছিলেন।

কিন্তু সেই জমিদারি এবং তার মালিক হওয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে একটি ছোট্ট কাজ– স্বামীর বিমাতা ও তার পুত্রদের বিরুদ্ধে একটি মামলা রুজু করা ও সেটি জেতা। দুই বোনের মধ্যে এই অজাত অথচ আসন্ন মামলাটি নিয়ে প্রতিদিনই শলাপরামর্শ হতো। একের পর এক উকিলের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে দু'জনেরই ধারণা হয়েছিল ঈশ্বর তাদের ধৈর্য পরীক্ষা করছেন। পাস করলেই একটা ভাল উকিল, অর্থাৎ যার টাকার খাকতি নেই এমন একজনকে পেয়ে যাবে।

অরবিন্দকে ওরা মামলার গূঢ় ব্যাপারগুলো বোঝাবার চেষ্টা করতেন। মৃদু শান্ত স্বভাবের অরবিন্দ চুপ করে শুনতো আর মাঝে মাঝে মাথা নাড়তো। তাকে শুনতে হতো কি কি সাক্ষ্য, দলিল ইত্যাদি দ্বারা জজকে জলের মত বুঝিয়ে দেওয়া যাবে কি গভীর জঘন্য ভয়ঙ্কর চক্রান্ত হয়েছে কনেপিসেকে জমিদারি থেকে বঞ্চিত করার জন্য। তাকে শুনতে হতো, বৈধ ও অবৈধ বিয়ের পার্থক্য, অনেক কিছু দেখেছে ও শুনছে এমন পুরোনো চাকর এবং কুলপুরোহিতের কথা, অনেক কিছু জানে এমন নায়েবের কথা এবং ওরা সবাই নাকি সাক্ষী দিয়ে বলতে রাজি এটা বা ওটা ঘটেনি বা ঘটেছিল। বাগবাজারে চিরোদের বাড়িতে গিয়ে প্রায়ই তার বেশিরভাগ সময় কাটানোর এটাও একটা বড় কারণ। তার বিরক্তি, ক্ষোভ, অনিচ্ছা বা মানসিক অবসাদের কথা কাউকে সে বলতে পারত না। এবং পরবর্তী জীবনেও পারেনি শুধু একমাত্র বন্ধু চিরোকে ছাড়া।

অথচ মানুষ হিসেবে পিসিরা অনাড়ম্বর, সহৃদয় ও নির্বিরোধী। কিন্তু ইহলৌকিক নানান ব্যাপারে তারা এতই মগ্ন ছিলেন যে, পিতৃমাতৃহীন একটি কিশোরের যে ধরনের মমতা ভরা ভালবাসা পাওয়া দরকার, তা দেবার মত সময়ও ওদের ছিল না। কোম্পানীর কাগজ, বেড়াল, ভাড়াটে এবং মামলার তোড়জোড় নিয়ে পিসিরা এতই ব্যস্ত থাকতেন যে, অরবিন্দের জন্য হৃদয়ের গহনে বাৎসল্যের মায়াময় কক্ষটির দরজা খোলার কথা তারা ভেবে উঠতে পারেনি।

চিররঞ্জন জার্মানী রওনা হবার আগে পর্যন্ত, অরবিন্দ যখন তাদের বাড়িতে যেত, তখনই চিরোর বোনের বন্ধু নন্দার সঙ্গে তার পরিচয় এবং পরে বিয়ে হয়। তখনই সে ঠিক করে বিরাট ফিল্ম ডিরেক্টর হবে। শিল্প ছাড়া কারুর কাছেই আত্মসমর্পণ করবে না এবং টালিগঞ্জের স্টুডিওগুলোতে যাতায়াত শুরু করে কলেজ যাওয়া বন্ধ করে।

তালতলায় সে একটি মানুষের জন্য কখনো কখনো কষ্টবোধ করেছে। তিনি স্বল্পবাক, নিস্পৃহ কনেপিসে। দু-একবার সে চিরোকে বলেছিল, 'এমন অবহেলা উপেক্ষার মধ্যে এভাবে বেঁচে থাকা, এমন ঘাড়গুঁজে নিজের আত্মাকে যাঁতাকলে পিষে মারা, আমি সহ্য করতে পারব না।' কনেপিসি স্কুলে বেরোবার পর একদিন তিনি ঘরে যখন মুখ নিচু করে চোখ বুঁজে সেতার বাজাচ্ছিলেন, অরবিন্দ তখন দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। সে শুধু দেখছিল, এক একটা টঙ্কারের রেস কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ওর দেহটি কুঁকড়ে যাচ্ছে, আত্মার গভীর থেকে একটা যন্ত্রণা বেরিয়ে আসার জন্য যেন ছটফট করছে সারা দেহ। বার করে দেবার পথ খুঁজে না পাবার খেদে মাথা নাড়তে নাড়তে আবার সেতারের এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে আঙুল চালিয়ে পরবর্তী ধ্বনিটিকে গভীরভাবে শুনছেন।

এক সময় হঠাৎ চমকে বাজনা বন্ধ করে তিনি তাকান। অরবিন্দকে দেখে বিস্মিত হবার পর স্মিত হেসে আবার বাজনা শুরু করার আগে অস্ফুটে বলেছিলেন, "পুরিয়া-কল্যাণ, অসময়েই বাজাচ্ছি।"

কিছুক্ষণ পর বাজনা থামিয়ে বলেন, "বাইরে কেন?"

"এই বেশ আছি। এসব আমি বুঝি না।" তারপর অরবিন্দ ভারী গলায় মৃদুস্বরে বলে, "আপনি তো কনফারেন্সে

বাজাতে পারেন।”

হেসে মুখ নামিয়ে উনি আঙুল দিয়ে তারগুলি মাজতে মাজতে অন্যমনস্কের মত বলেন, “ আসরে... না, সময় হতে অনেক বাকি।”

কনেপিসের বাকি সময় কখনোই পূর্ণ হয়নি। এর এগারো বছর পর অরবিন্দ যখন বোম্বাইয়ে এক ফিল্ম পরিচালকের তিন নম্বর সহকারী, তখন ট্রামের ধাক্কায় পথেই তিনি মারা যান। তার দু'মাস আগেই উচ্চ রক্তচাপের জন্য মারা গেছিলেন কনেপিসি। স্ত্রী মারা যাবার দিন চারেক পরই উনি, যে মামলাটি জেতা হয়নি এবং কোনদিনই জেতা সম্ভব ছিল না, সেই মামলার জন্য সংগৃহীত অকাট্য প্রমাণাদির স্তূপ রাস্তায় রেখে আগুন ধরিয়ে দেন।

যুক্তিনির্ভর ঠাণ্ডা মাথার নন্দা যাকে বিয়ে করে, তার কৈশোর পটভূমি মোটামুটি এই রকম ছিল। হাসি পাবার মত অনেক ব্যাপারই ছিল, কিন্তু তা থেকে মজাটুকু বার করে উপভোগ করার পক্ষে অরবিন্দের বয়স ছিল অপরিণত। তাহলেও, খুব পীড়াদায়ক ছিল না তার স্কুল ও কলেজের দিনগুলি। তালতলায় সে পেয়েছিল নিরাবেগ শীতল, অন্যমনস্ক, সহৃদয়তা, অথচ আকাঙ্ক্ষা ছিল গভীর উষ্ণ আবেগভরা দরদের, বশীভূতকারী মনোযোগের। নন্দা তাকে যা দিতে পারে তার থেকেও বেশী কিছুর।

চিররঞ্জন হামবুর্গে এক বিরাট ছাপা ও প্রকাশনা সংক্রান্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবিস থাকে দু'বছর। তারপর আরো দুটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে যন্ত্র ও ব্যবসায়ের জটিল ব্যাপারগুলি জেনে নিয়ে দেশে ফেরে। বিদেশে থাকাকালে অরবিন্দের সঙ্গে তার চিঠি লেখালেখি ছিল। চিঠি মারফতই সে জানতে পারে অরবিন্দ ও নন্দার মধ্যে প্রণয় সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু বিস্মিত হয়েছিল বিয়ের খবর দেওয়া চিঠি পেয়ে। নন্দার মত রসিকা, বুদ্ধিমতী, আকর্ষণীয় মেয়ে কি খুঁজে পেল ওই কিম্ভূতমুখো অরবিন্দের মধ্যে? শান্ত, রুচিশীল, মুগ্ধ ব্যবহার এবং একটি সুরেলা গভীর গলা, এছাড়া আর কিছুই তো ওর নেই! পড়াশুনায় মাঝারি, অর্থ-সম্পদে আরো মাঝারি- পৈতৃক একখণ্ড জমি ও কিছু টাকা। বিস্ময় সংযত করে চিরো লেখে, “অরো, আমি খুশি হয়েছি নন্দার মতো একটি ভালো মেয়েকে বিয়ে করেছিস বলে। নন্দাকে অনেকদিন ধরেই, যখন ও ক্লাস সেভেনে বুবুর সঙ্গে পড়তো তখন থেকেই জানি। ওরা অবস্থাপন্ন। এখন কিছুটা সচ্ছল থাকার মত রোজগারের কথা তো তোকে ভাবতে হবে।”

অরবিন্দ জবাব দিয়েছিল : “বিয়েটা যে কেন করেছি তা আমি নিজেই ভালভাবে বুঝতে পারছি না। হঠাৎ এক সন্ধ্যায় আমরা আউট্রাম ঘাটে বসে কথা বলতে বলতে বিয়ের প্রস্তাব দেই। নন্দা একটু ইতস্তত করে রাজি হয়ে গেল। কেন যে বললাম, কেন যে রাজি হল, জানি না। চিরো, আমি বোধহয় ভুল করেছি। কিন্তু শোধরাবার এখন আর উপায় নেই। নন্দা হয়তো আমাকে পছন্দ করে কিন্তু ভালবাসে না। প্যাসোনেট কথাটার ভদ্রগোছের বাংলা নেই, থাকলে বলতাম নন্দা তাই। ওর বোধ বা অনুভূতি শুধু দেহের উপর টলমল করে, চুঁইয়ে ভিতরে যায় না। ভাবার মত এটাই হচ্ছে পয়েন্ট। ও জীবন্ত হয় শুধু রক্তমাংসের ব্যাপারগুলোয় আর এটাই হয়তো আমার সমস্যা হবে। সচ্ছল থাকা বা না থাকা আমার সমস্যা নয়। বোম্বাই ফিল্ম মহলে একবার সেঁধোতে পারলে টাকার অভাব হবে না। আমি এখনো জানি না, কতটা কুরুচি, অশিক্ষা, নির্বুদ্ধিতা এজন্য অর্জন করতে হবে। না পারলে কলকাতায় ফিরে আসব। কিছু টাকা আর জমিটা তো রয়েছেই।”

অরবিন্দকে পাঁচ বছর পর কলকাতায় ফিরে আসতে হয়। বোম্বাইয়ে সে ব্যর্থ হয়েছিল। দুটি ছোট ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরী করা ছাড়া কিছু তার দ্বারা সম্ভব হয়নি।

চিররঞ্জন বিদেশ থেকে যখন কলকাতায় ফেরে, অরবিন্দ ও নন্দা তখন বোম্বাইয়ে। ফিরে প্রেস এবং ব্যবসার কাজে সে এত মগ্ন হয়ে যায় যে, বছর চারেক অরবিন্দের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারেনি। চিঠি এলে দায়সারা জবাব দিয়েছে বা দেয়নি। বোম্বাই থেকেই চিঠি আসা কবে যেন বন্ধ হয়ে যায়। যাতে কাজের সঙ্গে দিনরাত ওতপ্রোত থাকতে পারে তাই বাগবাজারের বাড়ি ছেড়ে সে ফ্ল্যাট নিয়েছে পার্ক সার্কাসে তার নতুন প্রেস বাড়ির কাছাকাছি। কাজের ক্ষেত্রে কিছুটা গুছিয়ে নিয়ে চিরো যখন হাঁফ ছাড়ার সময় পায় তখনই একদিন তার অফিসের ফোন বেজে ওঠে।

ধীর গম্ভীর গলাটি চিনতে তার মুহূর্তও দেরি হয়নি। সে চেঁচিয়ে উঠেছিল, “অরো। ”

"চিরো, বহু বছর পর। বোম্বাই ছেড়ে এসেছি মাস ছয়েক। তোর অফিসের কাছাকাছি আছি, এন্টালিতে। রাতে চলে আয়, খাবি। নন্দা ভালই রান্না করে।"

"ছ'মাস! এতদিন খবর দিসনি রাস্কেল! তুই আর পাল্টালি না!"

এইভাবে হঠাৎ আবার ওদের পুরনো বন্ধুত্ব ফিরে এল। চিরো সময় পেলেই অরবিন্দের ফ্ল্যাটে যায়। হাসি, গল্প, হৈচৈ-এর মধ্যে কিছু সময় কাটিয়ে আসে। অরবিন্দ আর নন্দাকে তার সুখীই মনে হয়। সন্তান হয়নি। এক গুজরাতিকে অংশীদার করে এবং তারাই টাকায় রেডিও-বিজ্ঞাপন ব্যবসা করছে অরবিন্দ, পার্ক সার্কাসে দুটো ঘর ভাড়া নিয়ে। নাম দিয়েছে 'অ্যাডভয়েস'। ফিল্ম তৈরীর ইচ্ছাটাও ছাড়েনি। তবে, আপাতত তার ইচ্ছা ডকুমেন্টারি ফিল্ম দিয়ে শুরু করার। কলকাতার ভোরবেলা এবং সন্ধ্যাবেলার তুলনামূলক স্টাডিকে সে বেছে রেখেছে বিষয় হিসাবে। শুরু করতে পারছে না টাকার অভাবে। 'অ্যাডভয়েস' ভাল পসার করতে পারেনি এখনো। সেজন্য অরবিন্দ বিব্রত ও চিন্তিত।

নন্দা চমৎকার গৃহিণী। মধ্য-তিরিশ অতিক্রান্ত তবু লাবণ্যের কর্ণারমাত্রও ঝরেনি। চিরো একদিন বলেছিল, "নন্দা তোমাকে ইটালিয়ান মেয়ে মনে হয়।"

ভ্রু কুঁচকে নন্দা বলে, "আগের দিন তো বলেছিলে সুইডিশ মেয়ে মনে হয়।"

অপ্রস্তুত হবার ভান করে চিরো বলে, "বলেছিলাম নাকি! চেহারাটায় যেরকম রেখেছো, তাতে ভূগোল-টুগোল কেমন গুলিয়ে যায়।"

নন্দা জবাব দেয়, "ভূগোল যায় যাক, ইতিহাসটা ঠিক রেখো। বিয়ে যদি করো তো বাঙালি মেয়েই করো, আর করলে এখনি করো। কানের চুলগুলোর রঙ পাল্টাচ্ছে দেখেছো কি?"

"পেকেছে! এই তো সেদিন চল্লিশ হলো! দ্যাখো তো কি মুশকিল, অকালপক্বতা আমার আর ঘুচলো না। অথচ বয়সে বড়ো অরোর একটা চুলও পাকেনি।"

"পাকবে কি করে, ওর তো বাল্যকাল এখনো শেষ হয়নি। তাহলে বোম্বাই থেকে কি পাততাড়ি গুটিয়ে চলে আসতে হয়?" হাসতে হাসতে নিচুস্বরে বললেও নন্দার গলায় শেষ দিকে যে তিক্ততার ছোঁয়া লেগেছিল চিরোর কানে তা ধরা পড়েছিল। অরবিন্দ তখন ঘরের এককোণে সোফায় পা গুটিয়ে, তার ডকুমেন্টারি ফিল্মের স্ক্রিপ্টে মগ্ন ছিল। কিন্তু চিরো তখন বুঝতে পারেনি এই দম্পতির ভাগ্যকাশে শীঘ্রই একটা কালোমেঘ জমবে এবং এখনকার এই রোদ্রোজ্জ্বল, নিবাত দিনগুলি শুধু তারই আগের অবস্থা। সে বুঝতে পারেনি এতে তারও একটা ভূমিকা থাকবে।

চিরো অফিসের কাজে ব্যস্ত, সেই সময় অরবিন্দ টেলিফোন করে ওকে 'গ্রীন ড্রাগনে' দুপুরে খেতে ডাকল।

"তোর সঙ্গে দু-একটা কথা আছে। "

"হাতে একগাদা কাজ এখন, কাল বরং যাব।"

"আমার কথাটাও জরুরি। তোর জানা দরাকার।" ভরাট গলাটা দ্বিধাগ্রস্ত মনে হল চিরোর।

" কি এমন যে, জানা দরকার?"

"এলে বলব। একা আলাদা বসে বলতে চাই। কাল নয়, আজই।"

অরবিন্দের মন্থর কঠিন স্বরের মধ্যে চিরো জরুরি তাগিদের আভাষ পেয়ে কয়েক মুহূর্ত ভেবে বলল, " বেশ যাব। "

"ঠিক একটায়, ঢুকেই বাঁদিকে থার্ড টেবল।"

"একটা নয়, সাড়ে বারোটা।"

"না একটায়, না হলে আসার মানে হয় না।"

"ব্যাপারটা কি বলতো?"

"ফোনে বলা যায় না।"

চিরোর কৌতূহল এবার সজাগ হয়ে আড়ামোড়া ভাঙ্গল। হাতের কাজগুলো সন্ধ্যা পর্যন্ত ফেলে রাখলেও ক্ষতি নেই, এই ভেবে সে বলল, "বেশ একটাতেই। দেখব কি তোর এমন কথা আজই না শুনলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে।"

"হ্যাঁ হয়ে যাবে। তোর কাছে না হোক আমার কাছে এটা বিরাট ব্যাপার। তোকে সব বলব, তোর মতামত নেব। তাহলে একটায়।"

ঠিক একটাতেই চিরো তার মোটর থেকে নেমে গ্রীন ড্রাগনে ঢুকল। বামে তৃতীয় টেবলে অরবিন্দ আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল, হাত তুলল। টেবলটার দিকে এগিয়ে যাবার সময় চিরোর মনে হল, অরোর নম্র চওড়া মুখের হাসিটা আজও বদলায়নি; শরীরটা এত বছরের সেইরকমই রুগ্ন রয়ে গেছে, ব্রহ্মতালুর চুলগুলোও। তবে ইদানীং বাইরের লোকের সামনে আগের থেকে একটু বেশি চুপচাপ থাকে।

"অরো, তোকে দেখেই বুঝতে পারি আমি কতটা মোটা হয়েছি। তোরা স্বামী স্ত্রীতে কি করে যে একই রকম চেহারা রেখেছিস- নিচু হয়ে জুতোর ফিতে বাঁধতে কষ্ট হয় বলে এখন বেশিরভাগ সময় চটি পরি।"

মুখোমুখি বসে চিরো কথা বলতে বলতে অরবিন্দের প্যাকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরিয়ে ফেলল। ধোঁয়া ছেড়ে মাথা ঘুরিয়ে পিছনে দাঁড়ান ওয়েটারকে চোখের ইশারায় ডাকল।

"একটা বীয়ার।" এই বলে সে অরবিন্দর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। "তোর জন্য কোক?"

"আমি এখন কিছু খাব না।"

সিগারেট প্যাকেটটা টেনে নিয়ে অরবিন্দ আঙুল দিয়ে টেবলের উপর ঘোরাতে লাগল। চিরো বুঝল, আরো কিছুও যোগ করবে এবার বাক্যটির সঙ্গে। ওর কথা বলার প্রায় ক্লান্ত, মন্থর ভঙ্গিটার সঙ্গে ইদানীং ও যেন ইচ্ছে করেই জুড়ে দিয়েছে বাক্যের মাঝে কয়েক সেকেন্ডের নীরবতা। যেন কিছু চিন্তা করে নিচ্ছে এবং সেই চিন্তা করার সময়টিতে সে শ্রোতার দিকে তাকাবে অদ্ভুত একটা হাসি নিয়ে। হাসিটা ঠোঁটে থাকে না, চোখেও নয়। থাকে চোখের পিছনে। ভাবখানা, যেসব কথা শুনছে তার সবটাই বোকামিতে ভরা এবং সেটা তাকে মজা দিচ্ছে। চিরোর মনে হয়, এটা ওর বানানো। সম্ভবত বোম্বাই থেকে ব্যর্থ হয়ে এবং এখন বিরক্ত গুজরাতি পার্টনারকে যথেষ্ট লাভ দেখাতে না পেরে, নিজের চারপাশে আত্মরক্ষার পাঁচিল তোলার জন্য কথা বলার এই অভ্যাসটা রপ্ত করেছে।

"আমি তোকে ডেকে এনেছি, সুতরাং অর্ডার যা কিছু আমিই দেব।"

অরবিন্দর চোখের পিছনে হাসিটা দেখে চিরো জ্বালা বোধ করে বলল, "খাদ্য ভক্ষণের কোন ইচ্ছে নেই।"

"কেন, ভূঁড়ি কমাবার জন্য?"

টেবলে পোটাটো চিপ্‌সের প্লেটটা রেখে, ওয়েটার বীয়ার ঢালছে গ্লাসে। চিরো সেদিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "কি জন্য ডেকেছিস?"

পোড়া দেশলাই কাঠি দিয়ে অ্যাশট্রের একটা সিগারেট খণ্ডকে খোঁচাতে খোঁচাতে অরো বলল, "বলছি।"

চিরো দীর্ঘ চুমুক দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। ঘরটা ভরে রয়েছে। বেশিরভাগই তার মনে হল, ব্যবসায়ী। একপ্রান্তে টেবল জোড়া দিয়ে জনা দশেক লোক ভোজনে ব্যস্ত। পাশের টেবলে বৃদ্ধ পার্সি দম্পতির সঙ্গে একটি যুবক, কথাবার্তা কমই হচ্ছে।

“নন্দাকে তোর কেমন লাগে? মানে, ওকে পছন্দ করিস?”

হঠাৎ এমন একটা প্রশ্নের জন্য চিরো বিন্দুমাত্রও তৈরি ছিল না। “খুব ভাল লাগে। দারুণ মেয়ে। কেন? পছন্দ তো নিশ্চয়ই করি! ”

অরবিন্দ মাথা নাড়াল, যেন এই উত্তরই আশা করেছিল, এই উত্তর সে নিজেও দিত। চিরো বিব্রত বোধ করল। বন্ধুর স্ত্রী সম্পর্কে যাই ভাবি না কেন, পছন্দ করি না, এ কথাটা কেউ কি বলতে পারে!

“ব্যাপারটা কি?”

“আমিও ওকে পছন্দ করি, আর সেটাই মুশকিলে ফেলেছে।”

“বহুলোকই তাদের বৌকে পছন্দ করে। শুনেছি এটা নাকি সর্দিকাশির মত জ্বালাতন ব্যাপার। অবশ্য কিছুদিন থেকে চলে যায়।”

হাসল না অরবিন্দ। মুখটা পাশের টেবলের দিকে ফিরিয়ে বলল, ‘নন্দাকে আমি ঠিক করেছি ছাড়বো, ডির্ভোস করতে চাই। চিরো, এটা তোকে বলা আমার উচিত। এটা তোর জানা দরকার। তুই আমার একমাত্র বন্ধু, আমাদের দুজনকে ছোট থেকেই দেখছিস। ”

চিরো বীয়ারের গ্লাসটা ধীরে ধীরে মুখে তুলল আচমকা ধাক্কাটা সামলাবার জন্য। কিন্তু কোনোভাবেই বিস্ময় প্রকাশ করল না। এটা তার বহুবিধ গর্বের একটি। গ্লাস খালি করে টেবলে রাখল। নিজেই বোতল থেকে বাকি বীয়ারটুকু ঢালতে ঢালতে যথাসম্ভব সহজ স্বরে বলল, “বটে, তা কারণটা কী?”

“কারণ আমি সুখী হতে চাই।”

“ভাল কথা, যুক্তিপূর্ণ কথা।”

অরবিন্দ ওয়েটারকে আর একটা বোতল আনতে ইশারা করল।

“মেয়েটির নাম কি?” এই বলে চিরো গ্লাসটা তুলল।

“কার নাম কি?”

চিরো হাসল। পাঁয়তারা করছে। অরো জানে তার পাঁয়তারা ধরা পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু ব্যাপারটার দিকে এগোবার এটাই চিরাচরিত পদ্ধতি।

“যে মেয়েটির প্রেমে তুই পড়েছিস। দেখেছি কি?”

“চিত্রা, চিত্রা ঘটক। তুই ওকে দেখিসনি।”

“তোকে আর নন্দাকে যতটুকু দেখেছি, তাতে এটুকু বুঝেছি তোরা অসুখী নোস। বরং যে ক’জন দম্পতি দেখেছি তাদের মধ্যে তোদেরই সব থেকে সুখী মনে হয়েছে।”

কথা না বলে অরবিন্দ কাঠি দিয়ে সিগারেট খোঁচাতে লাগল। চিরোর মনে এই সময় কয়েকবার দপদপ করে উঠল নন্দার অবয়ব। তার আচরণ, কথা বলার ভঙ্গি, হাসির শব্দ। চমৎকার মেয়ে নন্দা, সব থেকে বড় গুণ বুদ্ধিমতী, হৃদয় আছে, খাটিয়ে, চনমনে। এত বছর বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও শরীরে আকর্ষণ জিইয়ে রাখতে পেরেছে। ঠিকই বলেছি, চিরো ভাবল, ওকে নিশ্চয়ই পছন্দ করি। অরোও মিথ্যে বলেনি, এখনও পছন্দ করে। তাহলেও অসুখী কেন! হয়তো এই চিত্রা মেয়েটি ফুরফুরে চটকদার ধরনের। তাছাড়া, দাম্পত্য জীবনের এমন একটা সময় অরো হাজির হয়েছে যখন স্বামীরা বদল চায়। একঘেয়েমির চড়ায় ক্ষীণ হয়ে আসা মনের গাঙে জোয়ার চায় আবার বেগবান হয়ে ওঠার আশায়। ওরা এই সময়টায় বিপজ্জনক, অরক্ষিত থাকে। মেয়েটা তাক বুঝেই ওকে ধরেছে। অরোর থেকে বহুগুণে বুদ্ধিমান, ঠাণ্ডা প্রকৃতির লোকদেরও তো সে দেখছে এই সময় টসকাতে। চিরো ঠিক করল, এখন অরোর যা মানসিক অবস্থা তাতে তর্কাতর্কির পথে গিয়ে ফল হবে না।

“দেখতে কেমন, সুন্দরী?”

“আমার কাছে তো বটেই, অন্যে হয়তো নাও মনে করতে পারে।”

যাতে কোনরকম বিরোধিতার আভাস না ফোটে, সাবধানে সহজতা ফুটিয়ে চিরো বলল, “যদি গভীরভাবে অনুভব করে থাকিস তাহলে যা ভাল বুঝিস তাই কর। তবে নন্দা খুব আঘাত পাবে।”

“জানি।”

দুজনেই চুপ করে রইল। ওয়েটার দ্বিতীয় বীয়ার বোতলটি এনেছে।

“কতদিন মিত্রার সঙ্গে আলাপ?”

“ওর নাম চিত্রা।”

“ও, হ্যাঁ, চিত্রা।”

“বোম্বাই যাবার আগে ফিল্ম স্টুডিওয় একটা দুটো কথা হয়েছিল মাত্র। আলাপ মাস ছয়েক আগে।”

“অ্যাকট্রেস?”

“হ্যাঁ, এখন স্টেজে। অ্যামেচার গ্রুপগুলোয় করে, ভালই করে। তাছাড়া অ্যাডভয়েসেও এখন কিছু কিছু কাজ করছে। গানেও গলা আছে।”

“ফিল্মে সুবিধা করতে পারেনি।”

“ওর প্রথম বইয়ে আমি এডিটরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলাম। লাঞ্চ ব্রেকে ডিরেক্টর সনৎ রায়ের পাশে বসে চিত্রা, সেই সময় চিত্রার গায়ে হাত দিচ্ছিল ভদ্রলোক। চিত্রা একটু জোরে, রুঢ় স্বরে আপত্তি জানায় অনেকের উপস্থিতিতেই। ও ছিল নায়কের বোনের রোলে। নায়ক চড় মারবে ওকে, সেই টেকটা ছিল তার পরেই। শটটা পনেরোবার রি-টেক করাল সনৎ রায়। পনেরোবার চিত্রার গালে চড় মারল নায়ক বেশ জোরেই। চিত্রা একবারও আপত্তি করেনি। মুখে একটি যন্ত্রণার ভাঁজও পড়েনি। ডিরেক্টরের নির্দেশ মেনে সবকিছু করল। সেইদিন দেখেছিলাম ওর মর্যাদাবোধ আর ব্যক্তিত্ব। সিনেমায় নামার জন্য কত মেয়ে হা- হা করে ঘুরছে, পর্দায় একবার মুখ দেখাবার সুযোগ পেলে শুধু গায়ে হাত কেন, অনেক কিছুই অ্যালাও করতে রাজি। চিত্রা মোটামুটি ভাল রোলই পেয়েছিল নিউকামার হিসাবে, কিন্তু ওইদিনই সে নিজের ফিল্ম কেরিয়ার শেষ করে দেয়।”

চিরো লক্ষ্য করে যাচ্ছিল অরবিন্দকে। কথা বলতে বলতে চাপা গর্বে ও শ্রদ্ধায় চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। চিত্রার জন্যই। গলা খাঁকারি দিয়ে ভারিক্কি চালে চিরো বলল, “এই দেখেই কি তুই মুগ্ধ হয়েছিস?”

“হওয়ার এটাও একটা কারণ। মানুষের চরিত্র নানা ঘটনার মধ্যে দিয়েই তো ধরা দেয়।”

“এসব ব্যাপার কিছুদিন থাকে, তারপর শেষও হয়ে যায়।”

“কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা হবে না। এটা খাঁটি ব্যাপার।”

চিরো আবার মনে করার চেষ্টা করল নন্দাকে। বেচারা! কিভাবে ওকে রক্ষা করা যায়।

“ব্যাপার যখন শুরু করেছিসই এখন চালিয়ে যা। চিত্রাকে তুই ইয়ে, ভাবে, মানে গার্লফ্রেন্ড হিসাবে রাখতে পারিস। খাঁটি কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত না হওয়া পর্যন্ত এইভাবে চালা।’

‘সাহেবরা যাকে বলে মিস্ট্রেস?’

চিরো সামান্য ইতস্তত করল জবাব দিতে। কয়েক বছর বিদেশে বাস করে নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে তার অনেক ধারণাই ঢিলে হয়ে গেছে। লক্ষ্যে পৌঁছাতে যে কোন পথ ধরে চলতে তার আপত্তি নেই। চিত্রার সঙ্গে কিছু দিন প্রেমের ব্যাপার চালিয়ে অরোর যদি মোহ কেটে যায়, তাতে ক্ষতিটা কী! এইরকম ভেবে নিয়ে সে

বলল, 'যদি তাই তোর মনে হয়, তাহলে মিস্ট্রেসই ধরে নে। আমি শুধু এটাই বলতে চাই যে, নিশ্চিত হবার জন্য সময় দরকার। ব্যাপারটা গুরুতর। অরো, খুবই গুরুতর। নন্দাকে তুই প্রচণ্ড আঘাত দিতে যাচ্ছিস। তার আগে তুই চিত্রা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নে। তোর জীবনের পক্ষে এটা গুরুত্বপূর্ণ।'

'আমি নিশ্চিত।'

'অনেক সময় জুটেও যায়।'

'সেরকম ব্যাপার এটা নয়। সারা জীবন আমি অপেক্ষা করে আছি যার জন্য, আমার মনে হচ্ছে সেইরকম জিনিসই যেন অনুভব করছি।'

'শুনেছি, এইরকমই মনে হয় প্রথম প্রথম।'

অরবিন্দর মুখ থমথমে হয়ে উঠল। জবাব দিল না।

চিরো বীয়ারে মন দিল। ঘরের মধ্যে একটানা গুঞ্জনের মাঝে উচ্চকণ্ঠ ছিটকে উঠছে। ভোজনে ব্যস্ত টেবিল থেকে পাশের টেবিলের বৃদ্ধ দম্পতি ও যুবকটি কাঠের মত মুখ করে, প্লেটের দিকে তাকিয়ে অতি ধীরে খাদ্য চিবোচ্ছে। চিরো ভাবল, এরা কেউ টেরও পাচ্ছে না, এই টেবিলে শান্ত প্রকৃতির, ভদ্র এবং নিঃস্বার্থপর একটা লোক এখন এক দাম্পত্য বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তৈরী হচ্ছে, যার সঙ্গে ওর মানসিক গঠনের প্রতিটি তন্তুরই বিরোধ রয়েছে। এবং এই রকম ক্ষেত্রে চরিত্রের সঙ্গে অমিল কোন কাজ করার জন্য যখন কেউ চিন্তায় ডুবে যায় তখন সে মানসিক আবর্তের মধ্যে পড়ে। মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াটা খুব বেশি হয় না, যেহেতু তাদের চরিত্রে টানাপোড়েন সহ্য করার ক্ষমতাটা বেশি।

অরবিন্দের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চিরো জেনে গেল, অরো গোলমালের মধ্যে পড়ে গেছে। তারই অন্যতম লক্ষণ, পোটাটো চিপসগুলো একটি একটি করে সে আঙ্গুল দিয়ে ভেঙ্গেছে। ভাঙ্গা টুকরোগুলো আঙ্গুলের ডগা দিয়ে গুঁড়িয়েছে এবং ইতিমধ্যেই সারা প্লেটটাকে গুঁড়ো চিপসে ভরিয়ে ফেলেছে। এইসব লক্ষ্য করতে করতে চিরো হঠাৎ বিরক্তবোধ করল সারা ঘরের লোকদের প্রতি।

অবশেষে অরবিন্দ বলল, 'মুশকিল কি জানিস। নন্দা কখনোই আমাকে ভালবাসেনি। কোনদিনই না।'

'স্ত্রীদের সম্পর্কে এটা কোন নতুন আবিষ্কার নয়। কিন্তু নন্দা আর পাঁচটা মেয়ের মত নয়।' বিরোধিতা না করার সিদ্ধান্ত ভুলে গিয়ে চিরো বলল, 'এরকম অ্যাট্র্যাক্টিভ, উইটি, বুদ্ধিমতী, সংসারী মেয়ে তুই ক'টা পাবি? সব থেকে বড় কথা, মায়া-মমতা আছে ওর মধ্যে। অরো, আমি এটা বুঝছি না, এর বেশি আর কি তুই চাস?'

অরবিন্দ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। ওর চোখের পিছনে বিদ্রুপাত্মক বা বিভ্রান্তিকর হাসিটি নেই। ঝকঝক করছে এখন কৌতূহল ও উত্তেজনায়।

'কি চাস?' চিরো আবার বলল।

অরবিন্দ বুক ভরে শ্বাস টানল। যখন কথা বলল, ওর ভরাট মজা অচঞ্চল স্বরের অন্তরালে এমন একটা অসহায়তা চিরো অনুভব করল যা আগে কখনও তার কানে ধরা পড়েনি। চাকরি থেকে অবসর নেবার পর বিদায়-সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে অবসরপ্রাপ্তের গলা যেভাবে ধরে আসে, অরবিন্দের কণ্ঠে তাই ছিল।

'আমি সারাজীবন শুধু সেই রমণীর স্বপ্নই দেখেছি চিরো, যে সত্যিকারের প্রেমে আমাকে অভিভূত করেছে। হয়তো তোর মনে হবে ছেলে-মানুষী। এসব কথা কাউকে আগে বলিনি। অন্তত চিত্রাকে বলার আগে নয়। হয়তো স্কুল জীবনে সবাই পিছনে লাগত বলেই মুখচোরা স্বভাব পেয়েছি। তুই তো সব জানিসই। আমাকে তখন দেখতেও ছিল হাস্যকর রকমের, অনেকেই 'ডোনাল্ড ডাক' বলতো। হয়তো সে-জন্যই স্বপ্নটা আরও বেশী করে দেখতাম। কারণ আমার মত চেহারার লোকের প্রেমে কোন মেয়ে পড়বে, এটা আমি বিশ্বাস করতাম না। স্বপ্নটা সেজন্য খুবই দরকার ছিল। ছেলে-মানুষী মনে হচ্ছে কি তোর?'

'মনে হচ্ছে না,' কোমল স্বরে চিরো বলল। 'এসব ব্যাপার একদমই যে বুঝি না, তা নয়।'

চিরো অন্যদিকে তাকাল। তার মুখের ওপর অরবিন্দের চাহনিটা সে অনুভব করছে। কিন্তু সে জানে, মুখের ক্ষীণতম ভুল অভিব্যক্তি, অস্ফুট একটি ভুল স্বর, অরোর মুখ বন্ধ করে দেবে। যখন কেউ তার ভালবাসার মত অন্তরের গভীরতম অনুভবের কথা অপরকে বলতে থাকে তখন শ্রোতাকে প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানে ফেলতে হয়, নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ করে। নয়তো সে শামুকের মত গুটিয়ে ভিতরে ঢুকে যাবে।

'বিয়ের পর নন্দাকে প্রথম চুমু খাই ফুলশয্যার রাতে। ও চুমু খায়নি, খেতে দিয়েছিল। তখনই আমার কেমন যেন মনে হয়েছিল। ভুল করেছি বোধহয়। কিন্তু কার কাছে অভিযোগ করব? আমি নিজেই তো পছন্দ করে বিয়ে করেছি, ভেবেছিলাম, ওর মধ্য থেকে ভালবাসা বার করে আনব। কিন্তু আজও তা পারিনি।' অরবিন্দের স্বর থেকে অস্থিরতাটুকু কেটে গিয়ে সহজ ভঙ্গি ফিরে এসেছে। চিরো বলল, 'নন্দাকে বরফের মত ভাবা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'তা ও নয়। নন্দা ছটফটে, উষ্ণ প্রকৃতির। কিন্তু সেটা আমার কাম্য নয় চিরো, আমি অন্য ধরনের উষ্ণতা চেয়েছি, চাই।'

'হয়তো ও তোকে ভালবাসে, কিন্তু তুই সেটা বুঝতে পারিস না।'

'না না, বাসে না।' অরবিন্দ মাথা নাড়ল। ইতস্তত করে বলল, 'নিছকই সেক্স, তার বেশি কিছু নয়। ও আমাকে বিয়ে করেছে শরীর আর মস্তিষ্কের প্রভাবে, হৃদয়ের তাগিদে নয়।'

হঠাৎ হেসে উঠল অরবিন্দ। যেন এতটা বলে ফেলে লজ্জা পাচ্ছে। চেয়ারে হেলান দিয়ে সে শিথিল হয়ে বসল।

চিরো ভেবে পাচ্ছে না এবার সে কি বলবে। একটি বিবাহের পুরো শরীর, ধীরে ধীরে কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে তার সামনে উন্মুক্ত হয়ে আসছে। অদ্ভুত লাগছে তার। এই নগ্নতা দেখতে অনেকেরই হয়তো ভাল লাগবে, কিন্তু তার লাগছে না, আবার অপ্রতিভও বোধ করছে না। ঠিক কেমন যে লাগছে চিরো সেটা ধরতে পারছে না। শুধু মনে হচ্ছে একটি বৃদ্ধার দেহকে তার সামনে নগ্ন করা হচ্ছে এবং সে তাই দেখছে উদাসীনভাবে।

এই বৃদ্ধার দেহ একদা সুডৌল ও সুন্দর ছিল, কিন্তু এখন জীর্ণলোল-চর্মাবৃত।

অরবিন্দ সারা ঘরটায় চোখ বুলিয়ে বলল, 'কয়েকমাস আগে নন্দাকে বলেছিলাম, অবশ্য ঠাট্টাচ্ছলে, আমি মস্ত ডিরেক্টর হব, সত্যজিৎ রায়ের মত; প্রচুর অ্যাওয়ার্ড, দেশে-বিদেশে খাতির, শ্রদ্ধা। আমাকে ঘিরে তর্কবিতর্ক, প্রশংসার গুঞ্জন, স্তাবকতা, নিন্দা। আমি একটা কিছু হব, এই ভেবেই তো তুমি আমাকে বিয়ে করেছিলে!' ভেবেছিলাম নন্দা কথাগুলোকে অস্বীকার করবে। কিন্তু ভালভাবে মিথ্যা কথা ও বলতে পারে না। অস্বীকার করেনি। এদিক থেকে ও দারুণ সৎ।'

চিরো মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ সৎ। মনের জোরও আছে।'

'ও বলেছিল 'তখন যাই ভেবে থাকি না কেন, এখন তোমাকে আমি ভালবাসি।' আমি তা বিশ্বাসও করি। কিন্তু ওর মত করেই ও ভালবাসে। যখন বিয়ে করি, তখনকার থেকে এখন হয়তো বেশি ভালবাসে।' মুহূর্তের জন্য থেমে অরবিন্দ আবার বলল, 'ওর কথা শোনামাত্রই কেমন যেন অবশ হয়ে গেছিল ভিতরটা। হেসে উঠেছিলাম খুব জোরে। এই নিয়ে আর কখনও আমরা কথা বলিনি।'

'জীবনের কিছু একটা নিয়েই আমাদের বাঁচতে হয়, অরো।'

কথাটা বলেই চিরো ভাবল, অর্থহীন অসাড় কথাটা বললাম কেন? শুধুই নৈঃশব্দ ভরাবার জন্য!

অরবিন্দ মন্থর স্বরে বলল, 'নন্দা হল পাথর সাজানো সুন্দর একটা আংটির মত। প্রায় নিখুঁত, শুধু একটি জিনিস ছাড়া। আংটির মাঝের বড় পাথরটাই নেই, যেটার স্বপ্ন আমি দেখি।'

'ওর পক্ষে যা দেয়ার সবই তোকে দিয়েছে। যদি তোকে রোমান্টিক প্রেম না দিতে পারে, তার জন্য কি ওকে দায়ী করা যায়?' অরবিন্দ জবাব দিল না দেখে, চিরো কিছু আগে বলা নিজের কথাটাই আবার বলল, 'জীবনে কিছু একটা নিয়েই আমাদের বাঁচতে হয়। সবকিছুই আমরা পেতে পারি না।'

অরবিন্দ যখন নীরবে মাথা ঝাঁকাল, চিরো তখনই বুঝে গেল চিত্রা ঘটক, মহিলা যেমনই হোক না কেন, জিতে গেছে। হয়তো সে রঙচঙ করা সস্তা পুতুল কিংবা হয়তো পরিশীলিত সম্ভ্রান্ত কেউ; চিত্রা ঘটক যাই হোক না, আপাতত বিজয়িনী এবং নন্দা পরাজিত।

চিরো বিষণ্নবোধ করল নন্দার জন্য। এই ধরনের ত্রিভুজে বরাবরই ভাগ্যের মার পড়ে স্ত্রীদেরই উপর। অন্য মহিলাটি জানে যুদ্ধ চলছে। স্ত্রী কিন্তু একদমই অজ্ঞ থাকে এ সম্পর্কে। অন্য মহিলাটি প্রস্তুত হয়ে থাকে তার যাবতীয় অস্ত্র– মনোহরী আচরণ, হাস্য-লাস্য, মান-অভিমান ইত্যাদি নিয়ে ত্রিভুজের একটি বাহুর আকাঙ্ক্ষা ও তৃষ্ণাকে তৃপ্ত করতে। কিন্তু স্ত্রী যেহেতু কিছুই জানে না, তাই আচরণে আটপৌরে থাকে নিত্যদিনেরই মত– কখনো স্নিগ্ধ উৎফুল্ল, কখনো ভোঁতা, বিরক্তিকর, খিটখিটে। স্বামী নীরবে তাকে লক্ষ্য করে যায়, মনে মনে দোষ-ত্রুটিগুলোর তালিকা তৈরী করে তার সঙ্গে তুলনা করে চলে অন্য মহিলাটির গুণাবলীর। একটা অন্যায় সবসময়ই স্ত্রীদের বিরুদ্ধে ঘটে থাকে।

অরবিন্দ আবার বলল, “নন্দা কখনোই আমাকে ভালবাসেনি।”

গ্লাসটা নামিয়ে রেখে, যথেষ্ট বয়েস হয়েছে আরো, ছেলে মানুষী আচরণ তোকে মানায় না আর– এই কথাগুলো বলতে গিয়েও চিরো তখন, কিংবা পরে বা কোনদিনই আর তা বলার সুযোগ পেল না। কেননা সে দেখল অরবিন্দ হঠাৎ সিধে হয়ে বসেছে এবং মুহূর্তের মধ্যে তার চোখে এমন এক চাহনি ভেসে উঠল, যা চিরো কখনো কোন মানুষের মুখে দেখেনি।

চেয়ার থেকে অরবিন্দ যখন উঠে দাঁড়াল, চিরো তখন ওর রুগ্ন দেহ বা মাথার তালুতে খাড়া হয়ে থাকা চুলের কথাও ভুলে গেল। ভুলে গেল চওড়া হাঁ মুখ আর চশমাসহ ওর অতি সাধারণ দর্শন শীর্ণ মুখমণ্ডল। সে শুধু দেখল তার বন্ধু অদ্ভূতভাবে রূপবান হয়ে উঠেছে আভ্যন্তরীণ কি এক আবেগের আভায়। প্রতিটি কোষ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে লাবণ্য। তার মনে হল এই আবেগ, কাম, লোভ বা আত্মপ্রবঞ্চনা থেকে মুক্ত।

এবং না বলে দিলেও, চিরো সেই মুহূর্তে জেনে ফেলল, চিত্রা ঘটক ‘গ্রীন ড্রাগনে’ এসেছে। এটা তার কাছে অপ্রত্যাশিত। তীব্র কৌতূহল নিয়ে অরবিন্দের দৃষ্টি অনুসরণ করে সে প্রথমবার চিত্রাকে দেখার জন্য মুখ ফেরাল।

অরবিন্দকে দেখেই এগিয়ে আসছে চিত্রা। কচি কলাপাতা মুর্শিদাবাদ রেশমে জড়ানো পাকা ধানের আঁটি যেন বাতাসে দুলছে। হাল্কা, দ্রুত পা ফেলে চিত্রা টেবলের কাছে এল। কোমল দুটি চোখে বন্ধুত্বের চাহনি। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল চিরো, জোড় হাতে চিত্রাকে নমস্কার করতে দেখে।

“অরবিন্দের কাছে যা শুনেছি, তাতে এটুকু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না আপনিই ওর চিরো।” চিত্রা হাসল।

নমস্কার ফিরিয়ে দিয়ে চিরো ওর মুখের দিকে তাকিয়ে পাল্টা হাসল এবং ভাবল, উল্লুকের মত হাসলাম। চিত্রা যখন হাসে চিরোর তখন মনে হয়েছিল ওর সারা মুখ, নিথর দীঘির উপর দিয়ে ভেসে যাওয়া মেঘের ছায়ার মত। অনুভবগুলো মুখে নড়াচড়া করে।

চিরো তার পাশের চেয়ারটি টেবল থেকে সরিয়ে ধরে রইল। চিত্রা বসল। হাতের ব্যাগটি টেবলে রাখল। চিরো ওয়েটারকে ইশারা করল বোতল এবং গ্লাস নিয়ে যেতে। বোতল তখনো আধভর্তি।

“শেষ করবি না?”

“না। অনেকদিন পরে তো, ভাল লাগছে না খেতে।”

ডাহা মিথ্যে কথা। চিরো তাই অরবিন্দের মুখের দিকে তাকাল। চোখের আড়ালে সেই হাসিটা জ্বলজ্বল করছে।

“আপনি যে আসবেন, একদমই আমায় অরো বলেনি।”

“বললে কি করতিস? মেক-আপ নিয়ে আসতিস?”

চিরো অপ্রতিভ বোধ করল।

না, তাহলে নন্দাকে সঙ্গে নিয়ে আসতাম, এই কথাটা বলার ইচ্ছে দমন করে সে চিত্রার দিকে একটু ঝুঁকে বলল, "কিছু একটা আনতে বলি?" যা আশা করেছিল সে তা হল না। অনুরোধ উপরোধ ছাড়াই সহজ স্বাভাবিক স্বরে চিত্রা বলল, "হ্যা, আইসক্রীম। বহুদিন খাইনি।"

ক্ষীণ সুগন্ধ চিত্রার শরীর থেকে চিরো পাচ্ছে। তার মনে হল, এই সুগন্ধ ওর দেহের ভিতর থেকেই লঘু বাষ্পের মত বেরিয়ে আসছে।

"অরো?"

অরবিন্দ মাথা নেড়ে জানাল সে খাবে না।

"ও আমাকে কখনো অরো বলতে দেয় না। একমাত্র বন্ধুটি ছাড়া আর কারুর নাকি অধিকার নেই, ওকে অরো বলার।"

"তাই নাকি!"

নন্দাও বলে। কিন্তু সে কথা এখন প্রকাশ করা যায় না। অরো এটা লুকিয়েছে যখন লুকোনোই থাক। চিরো একবার শুধু অরবিন্দের দিকে তাকাল। চোখাচুখি হতেই অরবিন্দ মুখ নামিয়ে টেবলে পড়ে থাকা চিপসের একটা কণাকে নখ দিয়ে ভাঙ্গার চেষ্টা শুরু করল।

"আমারও একমাত্র বন্ধু ও। তবে চিরো নামের সর্বস্বত্বটি শুধু একজনের জন্যই সংরক্ষিত নয়। আপনার?"

"দেবী খেতাবটি দয়া করে জুড়বেন না। তবে আমারও একটা ডাক নাম আছে কিন্তু বাড়ির লোক ছাড়া আর কেউ ডাকলে লজ্জায় পড়ে যাব।"

"নামটা জানতে পারি।"

"বোঁচন"।

চিত্রা হেসে উঠল। চোখের কোণে হাসির কুঞ্চন তিরতিরে ঢেউয়ের মত। চিরো ভাবল, কত ওর বয়স? বড়জোর বত্রিশ। মুখের প্রসাধন এত সুক্ষ্ম যে বোঝাই যায় না। বসনের রেঙে নীরবতা, ফিকে কমলা ব্লাউজের হতায়, গলায় ও কোমরে রুচির ভ্রূকুটি। ছোট্ট মাথার সুগড়নটি পরিস্ফূট হয়েছে টেনে খোঁপা বাধার জন্য। চোয়ালে ঈষৎ চৌকো, ঠোট দুটি পূর্ণ। ওর সমগ্রতার মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিত্ব এবং তাকে জুড়ে আলগা স্নিগ্ধতা। চিরো অনুভব করল, তার মধ্যে কিছু একটা ঘটতে শুরু করেছে এবং সেটা অনুচিত।

" তোমার আজ সন্ধ্যায় কোথায় যেন রিহার্সল আছে না?"

অরবিন্দ বলল।

"হুঁ, ভবানীপুরে।" চামচে আইসক্রীম তুলে মুখে দেবার আগে থেমে ও বলল।

আগ্রহ বা কৌতূহল কোনভাবেই প্রকাশ না পায়, এমন স্বরে চিরো বলল, "কবে অভিনয়, কোথায়?"

"এগারোই মার্চ, স্টারে। খুব কাঁচা নাটক, ডিরেকটরও তাই।"

চিরো তারিখটা মুখস্থ করে রাখল। ওদের দুজনকে অ্যাডভয়েসে নামিয়ে দিয়ে অফিসে ফেরার পথে চিরোর চোখে ভেসে উঠতে লাগল, চিত্রাকে দেখামাত্র হঠাৎ কান্তিময় হয়ে ওঠা অরবিন্দের মুখ। কিন্তু এই কান্তি তো সারাক্ষণ ওর মুখে মাখানো থাকে না। হঠাৎ জেগে উঠেছে এবং শুধুমাত্র চিত্রাকে দেখেই। কিন্তু চিত্রার লাবণ্য? চিরোর মনে হলো, নিয়ত ওর ভিতরেই বাস করছে।

চিত্রা! মিষ্টি, সুন্দর। চিরো শব্দ তিনটি বারবার মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করল!

সেদিন রাতে অরবিন্দ ও নন্দা রেডিওর নাটক শুনছিল। ঘরটা আধো অন্ধকার, শুধু অরবিন্দর ঘাড়ের কাছে

টেবল ল্যাম্পটা জ্বলছে। ডকুমেন্টারি ফিল্মের স্ক্রিপ্টের খাতাটা নিয়ে পরিবর্তন-পরিবর্ধনে নিযুক্ত অবস্থাতেই সে মাঝে মাঝে নাটকটিতে কানে পেতে যাচ্ছিল। নন্দা বুকে বালিশ রেখে ডিভানে উপুড় হয়ে শুয়ে।

টাকা যোগাড় হলেই অরবিন্দ শূটিং শুরু করবে, কিন্তু টাকার পাত্তা নেই। জমিটা পড়ে আছে। বাড়ী করতে পারবে কিনা জানে না। জমিটা বন্ধক দেবার কথাও ভেবেছিল। কয়েক মাস আগে চিত্রাকে সে বলে, কলকাতার দুই বেলাকে বিষয় করে ছবি তোলার ইচ্ছাটা তার বহুদিনের। অর্থাভাবে পারছে না। কিছুদিন পর চিত্রা তাকে একটি লোকের সঙ্গে দেখা করতে বলে। লোকটি অর্থবান, খ্যাতিলোভী, অপেশাদার একটি নাটুকে দল করেছে স্বরচিত নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য। চিত্রা তার নাটকে অভিনয় করে।

অরবিন্দ লোকটির কাছে যায়নি। যে কোন লোকের কাছে গিয়ে সে হাত পাততে রাজি, কিন্তু নন্দার, চিরোর বা চিত্রা দ্বারা সংগৃহীত কারুর কাছে থেকে নয়। তার ধারণা, সব থেকে কাছের মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক এর পরে আর অটুট থাকতে পারে না। অনুগ্রহ নিলেই, দাতা কয়েক ধাপ উপরে উঠে যায়। গ্রহণকারীর মন কৃতজ্ঞতায় আবিল হয়ে আসে।

সে চিত্রাকে বলেছিল, “আমি সমানে সমানে থাকতে চাই। আমি চাই না তোমার কাছে কুঁকড়ে থাকতে। আমি চাই না তুমি কোন লোকের কাছে আমার জন্য অনুগৃহীত বোধ কর।” চিত্রা হেসে বলেছিল, “ভালবাসা হল তরঙ্গ, এটা স্নেহের মতই নিম্নগামী। তুমি আমার থেকে একটু নয় নিচেই থাকলে, ক্ষতিটা কি? আমি তোমায় ভাসিয়ে দেব।”

“ভাসিয়ে নয়, ডুবিয়ে দাও। আমি সাঁতরাতে চাই না, নিচে গিয়েই আশ্রয় পেতে চাই। চিত্রা, শুধু এই অনুগ্রহটিই তোমার কাছ থেকে আমি চাই।”

অরবিন্দ আজ নাটক শুনতে শুনতে মনে মনে তৈরি হচ্ছিল নন্দার সঙ্গে হেস্তনেস্ত করতে, ছাড়াছাড়ির কথা বলতে। কিন্তু কিভাবে যে শুরু করবে ভেবে পাচ্ছে না। কলম হাতে সে যত না নাটকে কান দিয়েছে, তার থেকেও বেশি ভেবে গেছে নন্দার প্রতিক্রিয়া কি ধরনের হবে। নন্দার স্বভাব সে জানে। নিশ্চয় সহজে ছাড়বে না। কিংবা যে রকম মাথা গরম, অহঙ্কারী, স্বাধীনচেতা, তাতে তাকে ধরে রাখার জন্য কান্নাকাটি, মান-অভিমানেরও আশ্রয় নেবে না। কথা কাটাকাটি, তিক্ত অভিযোগ; হয়তো এর বেশি গড়াবে না।

ব্যাপারটা কিভাবে পাড়বে, অরবিন্দ দিন কয়েক ধরেই তা ভাবছে। অপ্রত্যাশিত, আচমকা নন্দার সামনে উপস্থিত করলে আঘাত পাবে। অরবিন্দ জানে, আঘাত দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। কোনদিন কাউকে দিতে পারেনি। ডিভোর্সের কথা তোলার মত সঙ্গত পরিস্থিতি চাই। কিন্তু সেটাই খুঁজে পাচ্ছে না সে। পরিস্থিতি তৈরি করতেও ব্যর্থ হয়েছে। ডির্ভোস হলে নন্দার চলবে কি করে, তা নিয়ে সে মাথা ঘামাচ্ছে না। বাবার কাছ থেকে নন্দা পেয়েছে বারুইপুরে আট বিঘা বাগান ও পুকুর সমেত একতলা ছোট্ট একটি বাংলো বাড়ি। পৈতৃক হার্ডওয়্যার ব্যবসায়ের দু আনা অংশ, যার থেকে প্রাপ্য টাকা ওর নামে দাদারা নিয়মিত ব্যাংকে জমা দিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়াও অরবিন্দ নিজের জমিটা ওকে দিতে পারে যদি নন্দা টাকা দাবি করে। তবে ওর ধারণা নন্দা কিছুই চাইবে না। অত্যন্ত তেজী, অহংসর্বস্ব একরোখা মেয়ে সে।

নাটক শেষ হতেই নন্দা রেডিও বন্ধ করে দিল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আড়মোড়া ভেঙ্গে বলল, “কফি খাবে?”

“দাও।”

কফি নিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই নন্দা ফিরে এল। অরবিন্দ জানে, নাটকটি সম্পর্কে নন্দা এবার কিছু মন্তব্য করবে। সে অপেক্ষা করতে লাগল।

কাপে দুবার চুমুক দিয়ে নন্দা মুখ খুলল ঃ

“রেডিওর নাটকগুলোর এই এক দোষ, বড্ড বড় বড় সাজানো কথা বলে। যেমন অবাস্তব তেমনি বিরক্তকর।”

“কোনটা অবাস্তব মনে হল?”

“আগাগোড়াই। প্রেম মানেই যেন নিজেকে বিকিয়ে, সর্বস্ব সমর্পণ করে বসে থাকতে হবে। কেন রে বাবা!

এমন হয়তো ঘটে, লাখে বড়জোর একটা। তাই বলে, পতি দেবতাকে ধ্যান জ্ঞান করে নিজের মর্যাদা, ব্যক্তির অস্তিত্ব পর্যন্ত জলাঞ্জলি দিয়ে ভালবাসার জন্য মেয়েদের এই কাঙালেপনা, এসব ন্যাকামি বাংলা নাটকেই হয়।"

জবাব না দিয়ে অরবিন্দ কফিতে চুমুক দিল। কে জানে, এগুলো বহুবার বলা নন্দার খুবই প্রিয় কথা। বিনা প্রেমে বিয়ে করার সপক্ষে এইসব যুক্তি ভেবেচিন্তে সে তৈরি করে রেখেছে। নিজেকে ও বিশ্বাস করাতে চায়, অন্যেরাও বোধহয় তার মত শুধু মস্তিষ্ক আর যুক্তিতে চালিত হয়েই বিয়ে করে। ভেবেছিল অরবিন্দ ফিল্ম জগতে দিকপাল হবে। কিন্তু হয়নি। আসলে নন্দারই তো উচিত ছিল তাকে ছেড়ে যাওয়া। কিন্তু বদলে শুধু যুক্তি তৈরি করে গেছে এই আশ্বাসটুকু পাবার জন্য যে, তারই মত নিরাবেগ জীবন নিশ্চয় অন্য লোকেরাও যাপন করে।

"অরো, তোমারও কি মনে হয়নি। আসলে সাজানো কথা এসবই আত্মপ্রবঞ্চনা।"

"না।" অরবিন্দ তার ভরাট স্বরকে আরো ভরাট করল কঠোর শোনাবার জন্য। "প্রেমে আমি বিশ্বাস করি। আস্থা রাখি।"

নন্দা খালি কাপ টেবলে রাখার জন্য ঝুঁকল। টেবল ল্যাম্পের মৃদু আলো আটকা পড়ল ওর চুলের ঝালরে। কয়েক সেকেন্ডের জন্য নন্দার আবছা মুখটিকে কোমল করুণ এবং তরুণ মনে হল অরবিন্দের। তারপরই সে আরও ভরট স্বরে বলল, "তুমি তোমার মত করে ভেবেছ; যেহেতু এখনো সে তেমন লোকের দেখা পাওনি।"

"কিংবা হয়তো আমি অন্য মেয়েদের ধাতে গড়া নই।" এত মৃদু স্বরে নন্দা কথাগুলো বলল যে, অসহায়ের মত শোনাল।

"সর্বস্ব দিয়ে নিবেদনের যে সব কথা লোকে বলে, যাকে বলা হয় প্রেম, আমি এটা কিছুতেই অনুভব করতে পারি না। আজ পর্যন্ত কোন লোকের জন্যই এরকম কিছু বোধ করিনি।"

"কারণটা তো বললাম, সেরকম লোকের সঙ্গে তোমার এখনো দেখা হয়নি, তাই। দেখা হলে ঠিকই অনুভব করতে।"

"অসম্ভব।" নন্দা মশলার কৌটাটা নেবার জন্য ঝুঁকতে যেতেই অরবিন্দ চোখ সরিয়ে নিল। "দেবতার মত পূজো করা, ভক্তি করা, গদগদ হয়ে কথা বলা– এসব আমার ধাতে নেই। পুরুষদের সঙ্গে ঝরঝরে সহজ সম্পর্ক, বন্ধুত্বের মত টান, শারীরিক ঘনিষ্ঠতা যদি হয়তো হলো, এর বেশি আর কিছু আমার বোধগম্য হয় না।"

অরবিন্দ বলল, "প্রেম যখন হৃদয়ে আসে, তখন পুরুষ বা রমণী কি চায় জান? দিতে চায়, নিজেকে উজাড় করে দিতে চায়, বাঁচিয়ে রাখতে চায়, লালন করতে চায় তার প্রেমকে। সবার উপরে থাকে সমর্পণের ইচ্ছা।"

"কি জানি। এসব হয়তো পিসি সরকারই দেখাতে পারে।"

"ম্যাজিক! হ্যাঁ, ম্যাজিকেরই মতো। এক ঝলক চাহনি, একটু ঠোঁটের কাঁপন, মাথাটা হেলিয়ে রাখা, হাতের আঙুলের নড়াচড়া, এর প্রত্যেকটাই প্রেমকে জাগিয়ে তুলতে পারে। ম্যাজিকেরই মতো, কিন্তু খুবই সাধারণ ম্যাজিক।"

"হবে।" নন্দা মুঠো থেকে লবঙ্গ বেছে দাঁতে কাটতে কাটতে বলল, "এসব দেয়াটেয়া শেষ পর্যন্ত তো সার্থকতা পায় একটি জায়গাতেই– বিছানায়।"

"সেক্স?"

"তাছাড়া আর কি!"

অরবিন্দ চুপ করে গেল। নন্দার মুখ থেকে এ ধরনের কথা সে আগে কখনো শোনেনি। তাই ইচ্ছা করল তর্ক করতে, ওকে বোঝাতে সে এটা জীবনে হতাশ ব্যর্থ হওয়া মানুষদের মত চিন্তা। কিন্তু বিরক্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ায় কথা বলতে তার ইচ্ছা হল না।

অনেক্ষণ ওরা কথা না বলে রইল। তারপর হঠাৎ ফিসফিস করে নন্দা বলল, "অরো, আমি কিন্তু তোমায়

ভালবাসি।"

"বাসো নাকি?" অরবিন্দ তিক্ততা চেপে বলল, "হয়তো বাসো।"

"লোকেরা যে যেমন, আমি ঠিক সেভাবেই তাদের দেখি। তাদের গুণগুলোই শুধু নয়, দোষগুলোও দেখি, তাই কাউকেই আমার আহামরি মনে হয় না। এটা কি আমার ত্রুটি?"

"এত বাস্তববোধের ভার নিয়ে তুমি কুজোঁ হয়ে গেছো নন্দা। কিছুটা স্বপ্ন কিছুটা কল্পনা নিয়ে না থাকলে জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে।"

"স্বপ্ন মানুষকে ঝিমিয়ে দেয় অরো, মৌতাতের মত। বাস্তব থেকে যে সত্য উঠে আসে তাতেই আমি বিশ্বাসী। নিজের বোধবুদ্ধির কাছে অনুগত থাকা খুবই কঠিন ব্যাপার, তবু আমি তাই থাকতে চাই।"

"মনে হয় তুমি থাকতে পেরেছ।"

অরবিন্দ খাতা বন্ধ করে উঠে পড়ল। সারাক্ষণ হিজিবিজি কাটা ছাড়া আর কিছু সে করেনি। তেষ্টা পেয়েছে তার। জল দেবার জন্য চাকরকে না ডেকে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ফ্রিজের পাল্লা খুলতেই ঠাণ্ডা ঝলক মুখে এসে লাগামাত্র অরবিন্দ সচকিত হল।

এই হচ্ছে সময়। দীর্ঘদিন অপেক্ষা করছে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়ে ওঠার জন্য সেটা বোধহয় এই বার এসেছে। সাবধানে এখন কথা এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে সম্পর্কছেদের দিকে। মন থেকে এখন আবেগ ছেঁটে ফেলতে হবে, মায়া-মমতা হৃদয় থেকে মুছে ফেলতে হবে। ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল অরবিন্দর মুখ। চোখ কান থেকে হলকা বেরোচ্ছে। মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিয়ে সে ঘরে ফিরে এল।

নন্দা অপেক্ষা করছিল। অরবিন্দ ঘরে ঢোকা মাত্র বলল, "তোমার অন্য কোন মেয়েকে বিয়ে করা উচিত ছিল অরো। তোমাকে যেভাবে ভালবাসি, তাকে তুমি ভালাবাসা বলবে না। আমার থেকে আরো নরম, আরো ভীরু প্রকৃতির কাউকে বিয়ে করলে তুমি সুখী হতে। তুমি যা আশা করো, আমি তা পূরণ করতে পারি না, চেষ্টা করেও পারি না। এটাই আমাদের বিয়ের ট্রাজেডি। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি চেষ্টা করি ভাল স্ত্রী হতে।"

"সেটা ঠিক। তুমি যে ভাল স্ত্রী তাতে সন্দেহ নেই।"

কথাটা বলেই অরবিন্দর মনে হল, এটা এই মুহূর্তে স্বীকার করে কি ভাল করলাম? কিন্তু কথাটা সত্যি। নন্দা অত্যন্ত ভাল গৃহিণী। দুঃসময়ে পাশে থেকে ভরসা জুগিয়েছে, সান্ত্বনা দিয়েছে বন্ধুর মত, যত্নে কোন ত্রুটি নেই। আজ দ্বিতীয়বার অরবিন্দর মনে হল, নন্দা চমৎকার একটি আংটি, কিন্তু আমার জন্য মধ্যিখানের পাথরটিই তাতে নেই। অন্য লোকে তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না হয়তো, কিন্তু ওর পোড়া কপাল। আমি এই নিয়ে মাথা ঘামাই।

"আমি ব্যর্থ হয়েছি অরো?" নন্দা বা হাতে চুলগুলোকে কানের উপর থেকে সরাতে সরাতে চোখ বন্ধ করে বলল, "আমি যে পারিনি সেটা আমার দোষ নয়। পারিনি এই কারণে যে, তুমি যা চাও তা আমি দিইনি।"

এইবার যা দেবার সময় এসেছে। অরবিন্দ ভাবল, এইবার কি ওকে বলব? ওর জিভের ডগায় কথাগুলো জমে উঠেছে, অথচ বলার সময় বেরিয়ে এল অন্য কথা ঃ

"যে লোক হৃদয়ে আবেগে চালিত হয় তাকে যদি অতি বাস্তববাদী মেয়ে বিয়ে করে তাহলে ব্যর্থতা আসবেই। দোষ যতটা তোমার ততটা আমারও। কিন্তু তুমি সত্যিই আমার জন্য অনেক সয়েছ, করেছও।"

নন্দা চোখ বড় বড় করে অরবিন্দর দিকে তাকাল। অবিশ্বাস করছে না কিন্তু অবাক হচ্ছে। মুখে পাতলা হাসি। কামিজের গলার বোতামটা নিয়ে টানাটানি করছে।

"কিন্তু স্বামীদের জন্য যারা অনেক করে তাদের বিরাট মাশুলও গুনতে হয়।"

বোতাম ছেড়ে দিয়ে নন্দা বলল, "মানে?"

“যাকগে এসব কথা।” অরবিন্দ সিগারেট প্যাকেটের জন্য হাত বাড়াতেই নন্দা ঝুঁকে সেটা ঠেলে দিল। অরবিন্দ টের পেল নন্দা ব্রাসিয়ার পরেনি।

অরবিন্দর প্রথম ধোঁয়া ছাড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে নন্দা বলল, “কি মাশুল?”

“বাদ দাও।”

“না বলো।”

“মেয়েদের কি মনে হয় জানো? কাকড়ার গর্তে ল্যাজ ঢুকিয়ে বসে থাকা শেয়ালের মতো। পুরুষরা হলো ককড়া। ল্যাজটা কামড়াতেই শেয়াল গর্ত থেকে তাকে তুলে এনে খোলা ভেঙ্গে শাসটা গিলে ফেলে। যতদিনে না স্বামীটিকে মনের মত করে বানিয়ে নিতে পারছে, স্ত্রীরা ততদিন অনুরোধ উপরোধ, মান-অভিমান, খ্যান-খ্যানানি, ঝগড়া করে করে, দিনের পর দিন চাপ দিয়ে দিয়ে এমন একটা আকারে স্বামীকে এনে ফেলে, যখন আপন পরিশ্রমের ফল দেখে সে মুগ্ধ হয় আর উপভোগ করে। কিন্তু স্ত্রীরা ভুলে যায় এর জন্য তাকে দাম চোকাতেও হবে। পুরুষের ব্যক্তিত্বের কঠিন খোলাটি ভেঙ্গে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিলে, তার আত্মরক্ষার ক্ষমতাটাই নষ্ট হয়; যে কোন সময় বিপদে পড়ে যাবেই। স্বামী তখন যদি অন্য মেয়ের সজ্জায় পড়ে, স্ত্রীর তখন আকাশ থেকে পড়া, হাহুতাশ করা ছাড়া আর গতি থাকবে না। যে জিনিস সে খেটেখুটে তৈরী করল, সেটা তখন ভোগ করবে অন্য মেয়ে। এটা যে খুবই দুঃখের ব্যাপার তাতে সন্দেহ নেই।”

দীর্ঘক্ষণ থেমে থেমে কথাগুলো বলে অরবিন্দ সিগারেটের ছাই ঝাড়ল। নন্দা কোলের উপর দুটি মুঠো রেখে পায়ের দিকে তাকিয়ে বসে। একটা কথাও বলেনি। অরবিন্দ ধরে নিল, প্রবলভাবে পাল্টা আক্রমণ করার জন্য নন্দা তার অস্ত্র শানাচ্ছে। সেও তৈরি হয়ে আছে।

নন্দা ধীর শান্ত স্বরে বলল, “তুমি রোমান্টিক আবেগপ্রবণ, আমি তা নই। তোমার অন্য কাউকে বিয়ে করা উচিত ছিল। আমি বুঝি, তুমি আর আমাকে ভালবাস না। আমাকে তোমার ভাল লাগে, আমাকে তোমার দরকার, আমাকে ছাড়া তোমার চলবে না অথচ আমায় ভালবাস না। আর ভালবাস না।”

অরবিন্দ ভাবল, এইবার কথাটা শুরু করা যেতে পারে।

তারপরই সে বিষণ্ন হতে হতে দেখল নন্দা কাঁদছে। সিধে হয়ে বসে, কোলে দু-হাত রেখে, মুখটি নামিয়ে কাঁদছে। বাচ্চাদের মত ঠোঁট দুটি টিপে, সারা মুখ দোমড়ানো কান্না চাপার চেষ্টায় সারা শরীর থরথর করে যাচ্ছে।

‘কাঁদছি বটে কিন্তু আমি অনেক শক্ত মেয়ে অরো, অনেক শক্ত। কিন্তু তোমার দরকার নরম মেয়ে, তাই না?’

অরবিন্দ জবাব দিল না। তার মনে হচ্ছে, নন্দা কি বোকা। ভাবছে শক্ত মেয়ে কিন্তু আসলে শিশু। ভালবাসা পেতে চায় আবার কাউকে ভালবাসা দিতেও চায়। উপরে নিজেকে কঠিন বাস্তববাদী হিসেবে দেখাতে চায়। তার ঠিক নিচেই ঢাকা রয়েছে স্বার্থপরতা, লোভ, উদাসীনতা, অহঙ্কার। কিন্তু অত্যন্ত গভীরে লুকিয়ে আছে অসহায়, ভালবাসার কাঙাল আদত শিশুটি। সব মানুষই হয়তো এরকম, হয়তো আমিও।

কান্না জড়ানো গলায় নন্দা আবার বলল, ‘আমি জানি আমায় ছাড়া তোমার চলবে না।’

দেহের প্রতিটি কোষ থেকে চুঁইয়ে তৈরি হওয়া একটা তরঙ্গ ধীরে ধীরে ঘিরে ধরছে। অরবিন্দ সভয়ে লক্ষ্য করল তরঙ্গটা ঘিরছে তার হৃদয়কে। ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি সে বাঁধ দিতে শুরু করল এবং উত্তেজিত হয়ে দেখতে থাকল তরঙ্গটা ক্রমশই উঠছে উপর দিকে। সে বাঁধটাকে আর একটু উঁচু করতে করতে ভাবল, তাহলে আমাকে বিয়ে করা কেন? করলেই যদি তবে তৈরি হলে না কেন, যা আমি চাই তাই দিতে? অসম্ভব, আর এভাবে দুজনে স্বামী-স্ত্রী হয়ে থাকা যায় না। চিত্রা নিঃসঙ্গ, আমাকে তার দরকার। আমারও দরকার তাকে।

নন্দা দু’হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে। মাঝে মাঝে শ্বাস ছাড়ার শব্দ এবং দু’একটা ফোঁপানি। দুঃখটা যাতে নাটকীয় হয়ে প্রকাশ না পায়, তারই চেষ্টা করে যাচ্ছে নন্দা। অরবিন্দ আবার সভয়ে দেখল তরঙ্গটা আছড়ে পড়ছে বাঁধের উপর। ফাটল ধরছে। তরঙ্গ সরে গিয়েই আবার ফিরে আসছে প্রচণ্ড বেগে। এই তরঙ্গই কি মমতা!

ধরাগলায় নন্দা বলল, ‘আমি অনেক রকমভাবে চেষ্টা করেছি অরো। কিন্তু এতই কি সহজ? ’

মমতা, মমতা, মমতা। শিকারী টিকটিকির মুখের কাছে আরশুলা। পা ভাঙ্গা কুকুরের আর্তনাদ। হঠাৎ অজানা অমঙ্গল আশঙ্কায় কেঁপে উঠে অরবিন্দ দেখল তরঙ্গটা বাঁধ ছাপিয়ে প্রবল বেগে নামছে তার দিকে। হিংস্র আক্রোশে সেই বিপুল শক্তির সঙ্গে সে কিছুক্ষণ লড়াই করে হাল ছেড়ে দিল। থৈ থৈ জলে ভাসতে ভাসতে সে জেনে গেল, হার হয়ে গেছে।

চেয়ার থেকে উঠে মন্থরভাবে সে নন্দার পাশে এসে বসল এবং বাহুর বেড়ে তাকে বুকের কাছে টানল। ঠিক এই সময়ই অরবিন্দর মনে প্রথম চিন্তাটা আসে– নন্দাকে মেরে ফেলা ছাড়া তার কাছে মুক্তির আর কোন পথ খোলা নেই।

ঘুম ভাঙ্গতে দেরি হল আজ। নন্দা বিছানায় নেই। হাত বাড়িয়ে ড্রেসিং টেবিল থেকে ঘড়িটা তুলে অরবিন্দ সময় দেখল। এইবার চা নিয়ে ঘরে আসবে নন্দা। নিখুঁত গৃহিণী অনবদ্য স্ত্রী। কিন্তু মতিকে কাপ হাতে আসতে দেখে সে ভ্রু কোঁচকালো।

‘দিদি তো ভোরেই বারুইপুর গেছে।’

‘কখন ফিরবে?’

‘রাতে নয়, তো কাল প্রথম ট্রেনে। কি রাঁধব এবেলা?’

‘নিরিমিষ্যি। মুসুরিডাল, পেঁয়াজ, রসুন দিবি আর করলা ভাজা। আমড়ার টক, পোস্ত দিয়ে, ব্যস। ওবেলা আমি কল্যাণী যাব, রাতে খাব না।’

চা খেতে খেতে অরবিন্দ হালকা ঝরঝরে বোধ করল। নন্দা না থাকলেই আলস্যের মিঠে আমেজে গড়াতে পারে। দাড়ি না কামালেও চলে, পরিষ্কার শার্ট, ঝকঝকে জুতো না পরার জন্য ভ্রুকুটি নেই। বিয়ের আগের জীবনের স্বাদ খানিকটা যেন পাওয়া যায়। হঠাৎ তার মনে পড়ল রাঙাপিসিকে। বহুদিন যাওয়া হয়নি। একবার গিয়ে দেখে এলে হয় বুড়ি কেমন আছে।

বাড়িটা একই রকম রয়েছে। তিন বছর অন্তর কলি ফেরানর, মেরামত করানর অভ্যাসটা রাঙাপিসি বজায় রেখেছে। দু’ঘর ভাড়াটে আজও রয়েছে, তবে বীমার দালালের বদলে এখন এক সরকারী অফিসার। দোতলায় কনেপিসির ঘরটায় এখন রাঙাপিসি থাকে। অরবিন্দরা একতলায় যে ঘরটায় থাকতো এখন সেটা অর্ধেক জুড়ে আসবাব আর পুরনো জিনিসপত্র স্তূপ হয়ে রয়েছে। বাড়িতে রাজমিস্ত্রিরা কাজ করছে।

বাসন্তীর মা বছর পাঁচেক আগে মারা গেছে, তার জায়গায় এখন কাজ করছে বিধবা প্রৌঢ়া বাসন্তী। অরবিন্দকে দেখে সে অবাক হল, খুশিও।

‘কতদিন পরে গো। বোসো, চা করে দি। দিদ্‌মা তো বেইরেছে, গেছে তার গুরুজীর কাছে।’

‘কখন আসবে?’

‘এইবার আসার সময় হলো। কি ঝঞ্ঝাট যে এই মিস্তিরিগুলোকে নিয়ে হয়। খালি ফাঁকি আর ফাঁকি। রান্নাবান্নাও করবো আবার ওদের পেছনে খ্যাচ-খ্যাচও করতে হবে। একটু নজর আলগা দিয়েছ কি বিড়ি ফুঁকতে লেগে যাবে। তার ওপর কে চোর কে ছ্যাঁচোর তার ঠিক আছে নাকি। দ্যাখো না ঘর ভর্তি জিনিস কিভাবে আলগা রয়েছে। তোমার আমার কাছে মূল্যবান না হোক, দিদ্‌মার কাছে তো বটে। সবই তো ওর স্বামীর। তুমি বসো, আমি যাব আর আসব।’

অরবিন্দ ঘরে চোখ বুলিয়ে দেখল সব কিছুই তার মোটামুটি চেনা। তোষকের স্তূপের উপর দুটি বেড়াল ঘুমাচ্ছে। বাইরে থেকে আর একটি এসে ঘরে ঢুকলো! অরবিন্দকে আপাদমস্তক দেখে বেরিয়ে গেল। শুধু দেয়ালে দামী ফ্রেমে বাঁধানো রঙিন ছবিটাই নতুন। মধ্যবয়সী নাদুস-নুদুস, ঝোলা গোঁফ, ঘাড় পর্যন্ত চুল একটি

লোক খালি গায়ে মেঝেয় বসে, গভীর মনোযোগে ডেস্কে ঝুঁকে লিখছে। পিছনে র‍্যাকে সার দিয়ে মোটা মোটা খানবারো বই; একটি দেয়াল ঘড়ি। ছবির নীচে সাদা অংশে লেখা ঃ 'একদিকে স্বর্গ, ভাস্বর ভাবময় জগৎ। অন্যদিকে অস্বচ্ছ কর্মময় মর্ত্য জগৎ। একই ক্ষেত্রে স্বর্গ-মর্ত্যের মিলন অবলোকন করো, ধ্যান করো, দর্শন করো।'

অরবিন্দর বুঝতে বাকি রইল না, ইনিই রাঙাপিসির গুরুজী। ঘরের কোণে মেহগনি কাঠের কাঁচের পাল্লা দেওয়া বিরাট আলমারিটা ফাঁকা। রাঙাপিসি বিগ্রহের মত ওটাকে যত্ন করেন, হাত পর্যন্ত দেন না। ওর ডাক্তার স্বামীর বইপত্র, চিকিৎসার সরঞ্জাম ভরা বাক্সটি, নস্যির ডিবে, ছাতা, মাফলার, চশমা ইত্যাদি। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মত আলমারিতে রাখা।

কিন্তু ফাঁকা কেন? কৌতূহলী হয়ে অরবিন্দ আলমারির কাছে আসতেই কারণটা বুঝল। বছরের পর বছর নাড়াচাড়া না হওয়ায় উইপোকারা নিশ্চিন্তে তাদের চরিত্রগত অভ্যাস অনুযায়ী কাজ করে গেছে। মেঝেয় রাখা জিনিসগুলোর দিকে তাকিয়ে সে বুঝল, খুব বেশি দিন আগে আলমারিতে উই ঢোকেনি।

একটা বই তুলে সে পাতা ওল্টাল ঃ মাসিক পত্রিকা মালঞ্চ। আর একখানা তুলল ঃ মাইকেল গ্রন্থাবলী। বইগুলি বাঁধানো, সোনার জলে নাম লেখা। মোটা বই তুলে দেখল সেটি সুবল মিত্রের অভিধান, বাংলা থেকে ইংরেজী। তার নীচেই একটি লাল মলাটের বই তাকে আকর্ষণ করল ঃ ফরেনসিক মেডিসিন অ্যান্ড টক্সিকোলজি।

বইটি নিয়ে অরবিন্দ, ফুঁ দিয়ে ধুলো উড়িয়ে চেয়ারে বসল। বহুকাল আগে কনেপিসি একবার তাকে বলেছিল, 'জামাই বাবুর সখ ছিল নানান মিনারেলস ছাড়াও বেদে, দরবেশ, ফকির, কোবরেজ, হাকিম এদের সঙ্গেও খুব মেশামেশি করতেন।'

কথাটা এখন মনে পড়তেই অরবিন্দ একটু কৌতূহল বোধ করল। উইরা চমৎকারভাবে বইটি কেটেছে। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই, কিন্তু মাঝখানে গভীর কয়েকটি গর্ত এবং সেলাইয়ের কাছেও। বাইরের দিকের মার্জিনে মাঝে মাঝে পেন্সিলে লেখা মন্তব্য, কিন্তু এত অস্পষ্ট যে পড়া কঠিন।

কতগুলো বিষাক্ত অ্যাসিডের উপর সে চোখ বোলাল। হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড ও তার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে লেখার পাশে পেন্সিলে লেখা– এক চামচই যথেষ্ট। দু'ঘন্টাতেও কাবার হতে দেখেছি।

অক্সালিক অ্যাসিড। পেন্সিলে অস্পষ্ট লেখা- নার্ভাস সিস্টেম আর হার্ট... ৬০ গ্রেনেই।

অরবিন্দ পাতা ওল্টাতে লাগল। বেরিয়াম ফ্লোরাইড... আর্সেনিক... সায়ানাইড...এরপরই সে থমকে গেল পাতা উল্টিয়ে।

পাতার সঙ্গে লেপটে রয়েছে সেলোফেনের একটি মোড়ক। উইয়ে কাটতে পারেনি। মোড়কটি কাগজের মতই পাতলা। অরবিন্দ সেটি তুলে উল্টেপাল্টে দেখল। ভিতরে একটি পুড়িয়া আর এক টুকরো কাগজ রয়েছে। ফুঁ দিয়ে মোড়কটি ফাঁক করে সে কাগজটি বার করল। লাল কালিতে ক্ষুদে অক্ষরে লেখা ঃ হরিশপুরের কার্তিকের কাছ থেকে পাওয়া। কিছুতেই বলল না কোন্ সাপের বিষ আর কি শিকড় মিশিয়ে তৈরী করেছে। গন্ধ নেই, স্বাদ নেই, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই যন্ত্রণাহীন মৃত্যু। করোনারি থ্রম্বসিসের যা যা লক্ষণ হুবহু তাই। একটা দেশলাই কাঠির মাথায় যতটা ওঠে, ততটুকুতেই নাকি মানুষের উপর কাজ হয়। গোটা চারেক মানুষ নাকি মেরেছে, পোস্টমর্টেমে বিষ খুঁজে পাওয়া যায়নি।

কাগজটি ভাঁজ করে মোড়কের মধ্যে রেখে অরবিন্দ বইয়ের পাতা উল্টিয়েই থেমে গেল। ডাঃ বিশ্বাসের বলা কথাটা তার মনে পড়েছে– 'সব থেকে করুণাময় মৃত্যুর একটি হল করোনারি থ্রম্বসিস।'

কথাটি তিনি বলেন, বছরখানেক আগে এক সন্ধ্যায়, নন্দাকে পরীক্ষা করে ঘর থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময়। নন্দা বুকের বাঁদিকে অসম্ভব যন্ত্রণা বোধ করায় অরবিন্দ ডেকে এনেছিল ডাঃ বিশ্বাসকে। তিনি অবশ্য হজমের গোলমাল ছাড়া আর কিছু খুঁজে পাননি এবং বড়ি ও কিছু উপদেশ ছাড়া আর কোন ব্যবস্থা করে দেননি। নন্দা তাতেই সেরে উঠেছিল চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে।

সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় ডাঃ বিশ্বাস হালকা চালে, ডাক্তাররা যেভাবে বলে থাকে সেইরকম ঠাট্টাচ্ছলে

বলেছিলেন, 'নন্দার অসুখটা হয়তো অ্যানাজাইনা পেকটোরিস, এটা হয় করোনারি থ্রম্বসিস থেকে।' তারপর হো হো করে হেসে বলে ওঠেন, 'কেমন ভয়টা দেখালাম।'

তাহলে, যদি নন্দা- কি? কি হতে পারে? অরবিন্দর চিন্তা থমকে গেল। কিন্তু নিঃসারে তখুনি আবার ফিরে এল। চিন্তার পিছু নিয়ে অবশেষে সেটির শেষ প্রান্তে পৌঁছাল। নন্দা যদি হঠাৎই মারা যায়, যদি সেটা করোনারি থ্রম্বসিসের মতই মনে হয়, ডাঃ বিশ্বাসের নিশ্চয়ই মনে পড়বে তিনি অ্যানাজাইনা পেকটোরিসের কথাটা তুলেছিলেন....তাহলে করোনারি থ্রম্বসিসই তিনি ধরে নেবেন। অরবিন্দ কাগজটি মোড়ক থেকে বার করে আবার পড়তে পড়তে ভ্রু কোঁচকালো।

দরজার কাছে পায়ের শব্দ। চমকে উঠে অরবিন্দ মোড়ক এবং কাগজ সমেত হাতটা প্যান্টের পকেটে ভরে ফেলল।

চায়ের কাপ হাতে বাসন্তী।

'কতদিন ধরে দিদমাকে বলছি, ঝেড়েঝুড়ে জিনিসগুলো রোদে দাও, রোদে দাও! তা কথা কে শোনে। যেমনটি কত্তা রেখে গেছে তেমনটিই থাকবে! হলো তো? উঁইয়ের পেটে যাচ্ছে তো?

কাপটা ব্যস্ত হয়ে হাতে নিয়ে অরবিন্দ চুমুক দিল। হাতটা কেন পকেটে ঢোকালাম? এই প্রশ্নটা তখন তার মাথার মধ্যে হাতুড়ি হয়ে ঘা দিচ্ছে। তার চিন্তার আড়ালে যে ইচ্ছাটা লুকিয়ে সেটা যেন ধীরে ধীরে গুড়ি দিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে আসছে। অরবিন্দ ভয়ে কাঁটা হয়ে কাপ হাতে বসে রইল। তারপর কাপটি নামিয়ে, বাসন্তীকে অবাক করে সে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কল্যাণী থেকে গাড়ি চালিয়ে একা ফিরছিল অরবিন্দ। গাড়িটা তার পার্টনার যোশীর। অ্যাডভয়েসের কাজে সে গাড়িটা ব্যবহার করতে দেয়। অরবিন্দ কাজেই গিয়েছিল কল্যাণী। সঙ্গে টেপ রেকর্ডারে নাটক, যেটা অ্যাডভয়েস তৈরী করেছে ম্যাথুজ ফার্মাসিউটিক্যালসের চুল-ওঠা বন্ধের টনিকটির জন্য। ম্যাথুজের মার্কেটিং ম্যানেজার গৌর কুন্ডু কলেজ সহপাঠি ছিল অরবিন্দর, কল্যাণীতে বাড়ি। হঠাৎ পা ভেঙ্গে সে গৃহবন্দী। সে অনুমোদন না করলে বিজ্ঞাপন নাটক বরবাদ হয়ে যাবে। অনুমোদন করলে খরচ বাদে হাজার তিনেক টাকা থাকবে। অ্যাডভয়েসের বর্তমান অবস্থায় এটা অনেক টাকা। গৌর কুন্ডুকে খুশি রাখা এবং হাতে রাখা দরকার। ম্যাথুজ বিরাট প্রতিষ্ঠান, অনেকগুলো টয়লেট প্রডাক্ট ওরা বাজারে ছাড়তে যাচ্ছে। গৌর কুন্ডু দু'চারটি সামান্য সংশোধন সাপেক্ষে নাটকটিকে ছাড়পত্র দিয়েছে। অরবিন্দকে না খাইয়ে ছাড়েনি। খুশিয়াল মেজাজে সে গাড়ি চালাচ্ছে। ফেব্রুয়ারী শেষ হতে চলেছে। শীতের আমেজ রাতের শুকনো বাতাসে। জানালার কাঁচগুলো তুলে দিয়ে সে গরম রেখেছে ভিতরটা। বহুদিন পর একটা নির্দিষ্ট গতি বজায় রেখে গাড়ি চালাতে পেরে সে সুখবোধ করছে। গাড়িটাও অদ্ভুতভাবে সাড়া দিচ্ছে তার স্পর্শে। এঞ্জিনে টানা গুঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দ যেন নিজের উপর আস্থা পাচ্ছে। দুশ্চিন্তাগুলো মোলায়েম হয়ে আসছে। এই রকম সময়ে তার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে, ঠিকমত পারিপার্শ্বিক অবস্থা পেলে সে আর নন্দা আলাদা হয়ে শান্তিতে নিজেদের ইচ্ছামত বাস করতে পারবে। হয়তো সদ্ভাব বজায় রেখেই।

রাস্তার আলো কম। দু'পাশে বস্তি, খাটাল, কুলি-ব্যারাক, রাস্তাটা কখনো কখনো সঙ্কীর্ণ। খাটিয়ায় চাদর মুড়ি দেওয়া ঘুমন্ত মানুষের উপর দিয়ে হেডলাইটের আলো পিছলে যাচ্ছে বাক নেবার সময়। একটা সিগারেটের দোকান খোলা আছে দেখে সে গাড়ি থামিয়ে সিগারেট কেনার জন্য নেমেই অনুভব করল ঠান্ডাটা আজ একটু বেশি। সিগারেট কেনার সময় হঠাৎ পিছনে এসে দাঁড়াল একটি বাচ্চা। বয়স চার হতে পারে, দশও। একটা কাপড়ে মাথা ঢেকে হাঁটু পর্যন্ত জড়ানো। গলায় গিঁট। শীর্ণ হাত বাড়িয়ে জুলজুলে চোখে তাকিয়ে।

এত রাতে ভিক্ষে করছে? অরবিন্দ ঘড়িতে দেখলো বারোটা পঁচিশ। তারপর অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ওর দিকে। বাচ্চাটার মুখ নির্বিকার। ভিক্ষা চাওয়ার আবেদন নেই চোখে। শীতের জন্য কাতরতা নেই মুখে। সব কিছুই অভ্যাসের ব্যাপার।

সিগারেটওয়ালার দেওয়া খুচরো পয়সা যা পেয়েছে, অরবিন্দ বাচ্চাটার হাতে দিল। এক মুঠো দশ পয়সা। এই প্রথম ওর মুখে ভাবান্তর ঘটল। অবিশ্বাস ভরে পয়সাগুলো ও অরবিন্দর মুখ বারকয়েক দেখে পিছু ফিরে

গুটিগুটি এগিয়ে গেল। আবছা অন্ধকারের মধ্যে অরবিন্দ দেখল, একটা বন্ধ হোটেলের উনুনের ধারে, রাস্তায় জড়াজড়ি করে চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে নিয়ে একটি স্ত্রীলোক ঘুমাচ্ছে। বাচ্চাটি সেখানে গিয়ে উবু হয়ে বসে স্ত্রীলোকটিকে নাড়া দিতে লাগল।

মোটরে উঠে স্টার্ট দিল অরবিন্দ। যাবার সময় দেখল স্ত্রীলোকটি, হয়তো মা বাচ্চাকে চটাস করে পিঠে চড় মারল। রাস্তার বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে ভিখিরিনী শুয়ে, এটা এমন কিছু হৃদয়বিদারক ব্যাপার নয়। বহুবার শেষরাত্রে সে ডকুমেন্টারির জন্য রসদ খুঁজতে বেরিয়ে কলকাতার পথে পথে এ ধরনের দৃশ্য দেখেছে। প্রাত্যহিক মলমূত্র ত্যাগের মতই এটা মনে না রাখার ব্যাপার। কিন্তু এত রাত্রে বাচ্চাটার ভিক্ষা চাওয়া তার কাছে অদ্ভুত লাগছে। হয়তো ঘুম আসছিল না কোন কারণে। কি কারণে? ভিখিরির বাচ্চার আবার কারণ কি? হতে পারে, খিদেতে ঘুম আসেনি। খিদে একটা অমোঘ ঘটনা। অরবিন্দের মনে হল, ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করা বা দুঃখবোধ করাটা অনর্থক। এ ধরনের দুঃখের কাছাকাছি এলেই করুণায় আক্রান্ত হতে হবে, যন্ত্রণা শুরু হবে।

মানুষের স্বভাবই যন্ত্রণার কারণটিকে সরিয়ে দেওয়া। যদি তা না পারে, তাহলে এর আওতা থেকে পীড়িত মানুষটিকে দূরে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করবে। কিন্তু এটা যদি মনের যন্ত্রণা হয়, যদি ভাঙ্গা হৃদয়ের নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা হয়, যদি বিশ্বাস করে সমর্পিত হৃদয়ে আচমকা ছুরি খাওয়ার যন্ত্রণা হয়? অরবিন্দ ভাবল, এই ধরনের যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাওয়ার কোন উপায়ই নেই। বহু ব্যাপারে দয়ার কারণে খুনের কথা শোনা যায়। কিন্তু এই ধরনের পীড়ন থেকে মুক্তির জন্য একটা হাতও কি কেউ বাড়িয়েছে? অন্তত যন্ত্রণার পীড়ন থেকে রেহাই দেবার জন্য কেউ কি হত্যা করেছে?

'করেছে কি কেউ?' অরবিন্দ চেঁচিয়েই বলল, 'কে বলতে পারে! কেউ না। অন্যের হৃদয়ের মধ্যে কি ঘটছে তা কি দেখা যায়?'

এই মুহূর্তে তার মনে পড়ল মোড়কটি প্যান্টের হিপ পকেটেই রয়েছে। কাগজটায় যা লেখা ওটা সেই বিষয়ই কিনা সে জানে না। যে ধরনের কার্যকারিতার কথা লেখা হয়েছে, সত্যিই যে তেমনটি হবে কে জানে। কিন্তু যদি হয়?

যদি নন্দাকে খুন করি, অরবিন্দ অ্যাকসিলারেটরে চাপ কমিয়ে গাড়ির গতি মন্দ করে ভাবল, যদি ধরা পড়ি তাহলে সবাই আমাকে নিষ্ঠুর শয়তান বলবে। আশ্চর্য, যদি না আমি ওর মানসিক পীড়নের কথা ভাবতাম, তাহলে তো এতদিন ত্যাগ করেই চলে যেতাম। ফাঁসি যাওয়ার মত কাজের ঝুঁকিই নিতাম না। যারা শয়তান বলবে, তারা এই দিকটা দেখবে না। ঝুঁকি না নিয়েই, আমি যা চাই তাই পেয়ে যেতে পারি যদি নিষ্ঠুর হই।

'অদ্ভুত, ছেলেমানুষী, ওদের যুক্তি।' অরবিন্দ কথাটা বলেই গাড়ি থামাল। একটা লোক হাত তুলে রয়েছে। বোধহয় কোথাও পৌঁছে দিতে বলবে। দু'ধারে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল এখন সে কোথায়। চিন্তায় ডুবে গাড়ি চালিয়ে এসেছে। তার মনে হল, ব্যারাকপুরের পুলিশদের সদর আস্তানা সে পার হয়ে গেছে।

'শ্যামবাজারের দিকে যাবেন কি?'

'হ্যাঁ।'

'সিঁথির মোড়ে নামিয়ে দেবেন?'

অরবিন্দ ঝুঁকে পাশের দরজাটা খুলে দিল।

'বাঁচালেন।' গাড়ি চলা শুরু হতে লোকটি বলল। 'এত রাতে বেরোন যে কি দুর্ভোগ! অথচ না হলেই নয়।'

অরবিন্দ আড়চোখে লোকটিকে দেখল। মাঝ বয়সী। টাক পড়ে গেছে। গাল বসা। ময়লা নীল শার্ট। বাসি ঘামের গন্ধ।

সীটের উপরই সিগারেট আর দেয়াশলাইয়ের বাক্সটা রাখা। অরবিন্দ তুলে নিয়ে এগিয়ে ধরল, 'খান্।'

ইতস্তত করে কৃতজ্ঞ হাসির সঙ্গে লোকটা সিগারেট বার করল। ধরাল।

এত রাতে বাইরে কেন? অরবিন্দ অনুমানের চেষ্টা করল।

মাতাল নয়। চোর-ডাকাত হওয়া অসম্ভব। বেশ্যাবাড়ি থেকে ফিরছে? কিন্তু এতদূরে তাহলে কেন? সিঁথির কাছাকাছি কি ওরা নেই?

'এত রাতে বেরিয়েছেন?'

'বন্ধু মারা গেল। কাল ভোরেই কাজে বেরুতে হবে, শ্মশান থেকেই চলে এলুম। ছোটবেলার বন্ধু।'

চোর-ছ্যাঁচোর, ডাকাত, মাতাল, বেশ্যাসক্ত এবং শোকগ্রস্ত, সবাই প্রায় একই রকম দেখতে, একই জামা-কাপড় পরে, সিগারেট দিলে একইভাবে টানে। অরবিন্দ মুখ খুলল, 'শুনে খারাপ লাগছে মনটা। ছেলেবেলার বন্ধুরা প্রাণের কাছের মানুষ হয়।'

লোকটি সিগারেটে লম্বা টান দিল। সামনের কাচে অরবিন্দ লাল আভা দেখতে পেল।

লোকটি বলল, 'মরে অবশ্য বেঁচেছে। পাঁচ মাস ধরে ক্যান্সারে কষ্ট পাচ্ছিল। ভালই হল। দুদিন আগে আর পরে, এই তো ব্যাপার। আমাদের সবাইকে তো একদিন যেতেই হবে।'

'হ্যাঁ, আমাদের যেতে হবে।'

'গোড়ায় ধরা পড়েনি। পড়লে তখনি অপারেশন করিয়ে নিলে হয়তো আর কিছুদিন বাঁচতে পারত। ডাক্তার বলেছিল, খুব একটা লাভ অবশ্য তাতে হতো না। যাক্ রেহাই পেয়ে গেল। বাঁচার জ্বালা-যন্ত্রণাও তো কম নয়। তা থেকে রেহাই পেল।'

চিরকালের মামুলি কথা, সান্ত্বনা। অরবিন্দের মনে হল, তবু কখনো কখনো সময়বিশেষে এগুলোর ব্যবহার যোগ্যতা বয়ে যায়। আমাদের সবাইকেই একদিন যেতে হবে। রেহাই পেয়ে গেল। কৌটায় ভরা কথাগুলো যেন তাকে সাজানো রয়েছে। দরকার হলেই পেড়ে নাও। সরল, অশিক্ষিত মন যখনই কষ্ট পাবে, তখনি কৌটা থেকে বার করে খেয়ে নাও বা মালিশ করো। অমনি জুড়িয়ে যাবে।

অরবিন্দ বলল, 'আমরা কেউই চিরকাল বাঁচব না।'

'খাঁটি কথা।' লোকটি শেষটান দিয়ে সিগারেটটা ফেলার জন্য জানালার কাঁচ নামাতে ব্যস্ত হল।

'সবকিছু চুকেবুকে বন্ধুটি তাহলে রেহাই পেল।'

'হ্যাঁ। তবে ডাক্তারের কাছে গোড়াতেই ওর যাওয়া উচিত ছিল। ক'টা দিন তবু তো বাঁচতো। ওই সামনের দোকানটার কাছে দাঁড় করাবেন।'

অরবিন্দ গাড়ি থামাল। লোকটি নেমে নমস্কার করতেই একবার মাথাটি ঝুঁকিয়ে সে গাড়ি ছেড়ে দিল।

ঠিকই বলেছে লোকটা, রেহাই পেয়ে গেল। যন্ত্রণা ভোগ সম্পর্কে এভাবে চিন্তা না করলে, এমন মনোভাব না নিলে, শেষে পাগল হয়ে যেতে হবে। একমাত্র নরক ছাড়া বোধহয় যন্ত্রণাটা আর কোথাও চিরস্থায়ী নয়। অবশ্য নরক বলে যদি কিছু থাকে। সব কিছুর শেষেই কোনভাবে আছে শান্তি, যন্ত্রণা থেকে রেহাই, ভয় থেকেও। শেষ হওয়া, চুকে যাওয়া এবং একটা কোথাও পৌঁছানো, চিরকালের জন্য। এই পৃথিবীর যাবতীয় আর্তনাত, যন্ত্রণা, ভয়ের সঙ্গে মোকাবিলার একটিই পথ- শেষ করে দাও। অন্য কোন চিন্তার পথে গেলে কপালে হাত দিয়ে গোঙানো ছাড়া আর কিছু করার থাকবে না।

চিড়িয়ামোড়ে এক কনস্টেবলকে একাকী দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে দেখে হঠাৎ অরবিন্দর ইচ্ছা হল, স্বাভাবিক মানুষের দুঃখ ভারহীন, নিরুদ্বিগ্ন, জোরালো এমন এক কণ্ঠস্বর শুনতে, যা তাকে এখনকার এই ফাটকাবাজ, কুচক্রী চিন্তার জগৎ থেকে টেনে বার করে নিয়ে যাবে।

গাড়ী থামিয়ে সে জানালার কাঁচ নামিয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'পাতিপুকুর কোন্ রাস্তা দিয়ে যাব?'

কনস্টেবল তাড়াতাড়ি সিগারেট ফেলে এগিয়ে এল।

আপনি এদিক দিয়েও যেতে পারেন। পূর্বের রাস্তাটি দেখিয়ে সে হাত তুলল। সোজা যাবেন স্যার। দমদম স্টেশন ছাড়িয়ে, মতিঝিল ছাড়িয়ে, নাগের বাজার, ডানদিকে বেঁকবেন। আর পাইকপাড়া ঘুরে যেতে পারেন স্যার। সোজা গিয়ে টালাব্রিজের আগেই বাঁদিক দিয়ে রাজা মনীন্দ্র রোড...'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ও রাস্তাটি চিনি। আচ্ছা খোড়াখুড়ি হচ্ছে শুনেছিলাম?

'বাসটাস তো ওই দিয়েই যায়।'

'আচ্ছা ভাই।'

ক্লাচ চেপে অরবিন্দ প্রথম গিয়ার দিল। কথা বলার আর কিছু নেই। শ্যামবাজারের দিকে যেতে যেতে সে এখন নিজেকে ঝরঝরে বোধ করছে। পুলিশটার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করতে পারলে হয়তো ব্যাপারটাকে একটা জায়গায় দাঁড় করানো যেত। লোকটার গর্তে ঢোকা চোখ, তোবড়ানো গাল, কর্কশ গলা, কুঁজো পিঠ দেখে মনে হয় কট্টর বাস্তববাদী। কাল্পনিক কথাবার্তার ধার ধারে না।

অরবিন্দ কথা বলতে শুরু করল পুলিশটির সাথে।

'না স্যার, বনিবনা না হলে বৌকে খুন করাটা উচিত হবে না। ওসবে দরকার কি, শিক্ষিত অবস্থাপন্ন আপনি, আপনার বৌও, বললেন লেখাপড়া জানে, বাপের অনেক পয়সাও পেয়েছে। ডাইভোর্স করলেই তো ল্যাটা চুকে যায়। আজকাল তো শিক্ষিত লোকেরা এটা খুব করছে। আপনি বিয়ে করে নেবেন, বৌও বিয়ে করে নেবে কিংবা চাকরি-বাকরি করবে। কিন্তু খুনের কোন রেহাই নেই, ফাঁসি ছাড়া কোন সাজা নেই।'

'কিন্তু ওর লজ্জা, ওর যন্ত্রণা থেকে আমি ওকে বাঁচাতে চাই। যে ক'টা দিন বাঁচত, নয়, তার থেকে ক'টা বছর কমে যাবে, তাতে কিছু কি এসে যায়? অনন্ত সময়ের সমুদ্রে একটা জীবনকাল তো বুদ্বুদমাত্র।'

'স্যার, অনন্ত সময় কি জিনিস তা আমি জানি না, কিন্তু খুন জিনিসটা জানি।'

'কিন্তু এই খুনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে করুণার প্রশ্ন।'

পুলিশটি তখন সিগারেটে মস্ত টান দিয়ে ফুকফুক ধোঁয়া ছেড়ে বলবে, 'খুন খুনই, আপনি তার যে নামই দিন।'

'নিকুচি করেছে। নন্দা রক্তে-মাংসে গড়া, আশা নিয়ে, ভবিষ্যৎ নিয়ে দিন কাটায়। আমি সেই আশারই একটা অংশ, কি করে আমরা দু'জন তাহলে রেহাই পাব?'

পুলিশটি অবাক হয়ে তাকাবে। তারপর বলবে,

'আপনার কথা শুনে মনে হয়েছে, আপনার বৌ যুবতী, দেখতে-শুনতেও ভাল। পৃথিবীতে আরো অনেক লোক আছে যাকে তার পছন্দ হতে পারে। তাহলে খুন করার দরকারটা কি? একদমই দরকার নেই।'

'আমাকে ছাড়াই তাহলে ওর দিব্যি চলে যাবে?'

'খুবই আঘাত পাবেন। এসব ক্ষেত্রে মেয়ে লোকদের অহঙ্কারে ঘা লাগে। ওরা স্যার, বড় অহঙ্কারী হয়।'

'তাহলেও, শেষ পর্যন্ত আমাকে ছাড়াই ওর চলে যাবে।'

'তাই তো মনে হয়। আপনি যদি কথাটা পাড়তে পারেন স্যার, তাহলে মনে হয় না উনি বাধা দেবেন।'

শ্যামবাজার মোড়ে পৌঁছবার আগেই অরবিন্দ মনস্থির করে ফেলল। ব্যাপারটা নিয়ে সে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। নিজেকে হাস্যকর এবং আধাপাগলামির পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে গলাটা ফাঁসির দড়িতে পরিয়েই ফেলেছিল প্রায়। অথচ খুব সহজে ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলা যায়। নন্দাকে ছেড়ে সে কোথাও একটা ঘর নিয়ে থাকবে, তারপর দু'জনে একমত হয়ে একবছর পর ডিভোর্স। চিত্রাকে নিয়ে নতুনভাবে জীবন শুরু করা। তারা দু'জনে। শুধুই দু'জনে চিরকালের জন্য। চিত্রার থেকে নন্দা অনেক শক্ত মেয়ে। আঘাত অবশ্য পাবে, কিন্তু কি আর করা যাবে। আবার ঠিক দাঁড়িয়ে যাবে, এখনকার থেকে হয়তো আরো সুখী জীবন পাবে। অরবিন্দ ভাবতে ভাবতে শিউরে উঠে আপন মনে বলল, অথচ বোকামি করে কিনা ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে যাচ্ছিলাম!

গাড়ি যখন তার ফ্ল্যাট বাড়ির দরজায় পৌঁছল, অরবিন্দ তখন ঠিক করে ফেলেছে, যা করার চটপট করতে হবে। দেরি করলে আর সে পারবে না।

দরজা খুলে দিল মতি।

'দিদি ফিরে এসেছে। ঘুমোচ্ছে।'

'কখন?'

'সন্ধ্যার পর। দিনেন বাবু গাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।'

'কিছু আছে খাবার মত'?

বিব্রত মুখে মতি বলল, 'দু-তিনটে কলা আছে।'

'থাক, শুয়ে পড়।'

'মাছ ভাজা আছে। দিনেন বাবু প্রায় তিন কেজি একটা রুই ধরে দিদিকে দিয়েছেন।'

'থাক।'

অরবিন্দ বসার ঘরে এসে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল। ছাই ফেলার জন্য অভ্যাসবসে অ্যাশট্রের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে দেয়ালে তার এবং নন্দার ছবিটায় চোখ পড়ল। পুরীতে সমুদ্রের ধারে এক বন্ধু তুলে দিয়েছিল। বুককেসের ওপর ঢোকরাদের তৈরি একটা হাতি, তার পিঠে শিব দুর্গা, কার্তিক গণেশ। বাঁকুড়ায় বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে গিয়ে নন্দা কিনে আনে। তার পাশে ফ্রক পরা নন্দার একটি ছবি।

জিনিসগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অরবিন্দ চেষ্টা করল, স্মৃতির মধ্যে ডুব দিয়ে আবেগভরা দু'একটি রত্ন তুলে আনতে। কিন্তু একটিও উঠল না। সবই হারিয়ে গেছে। এক দম্পতি, একটা পেতল-কাঁসার হাতি, এক সুশ্রী বালিকা মাত্র তার চোখে পড়ল।

আবার সে জানালার ধারে দাঁড়াল। কোথাও একটা আস্তানা ঠিক করতে হবে, অরবিন্দ জানালা দিয়ে সিগারেটটা রাস্তায় ফেলে ভাবল, দু'চারদিনের মধ্যেই। হোস্টেল, বোর্ডিং, মেস যেখানে হোক, অল্প খরচের। তারপর একটা চিঠি নন্দাকে পাঠিয়ে দেয়া। তাতে সবকিছু বুঝিয়ে লিখবে, প্রশংসায় ভরিয়ে দেবে। অবশ্য প্রশংসা করলে অযথা মিথ্যা হবে না। নিজের ঘাড়ে সেসব দোষ চাপাবে, নিজের গায়ে কাদা মাখাবে, নিজের দুর্বলতাকে দায়ী করবে।

কোনরকম সমালোচনা থাকবে না, যত ঝগড়া হয়েছে তার উল্লেখও নয়। অনুযোগ, অভিযোগ, হতাশাও নয়। নন্দাও খানিকটা এ জন্য দায়ী যেহেতু সে হৃদয়ের বশবর্তী হয়ে বিয়ে করেনি, এসবেরও কোন ইঙ্গিত থাকবে না।

চিঠিটা পাঠিয়ে দিয়ে আর সে ফিরবে না। অরবিন্দ নিজেকে ভালভাবেই জানে। ফিরে এলেই সে দুর্বল হয়ে যাবে। যদি নন্দা কান্নাকাটি করে কিংবা মানিয়ে চলা যায় কিনা দেখার জন্য আর একটি সুযোগ দেয়ার জন্য মিনতি করে, তাহলে সে কঠিন হয়ে নিজেকে ধরে রাখতে পারবে না। এ ঝুঁকি সে নেবে না।

সারা ফ্ল্যাট বাড়িটা নিঝুম। মতি শুয়ে পড়েছে। অত্যন্ত ঘুমকাতুরে। অরবিন্দ খিদে বোধ করল আবার। রেফ্রিজারেটরে এক থালা ভাজা মাছ থেকে চারটে টুকরো তুলে নিয়ে সে বসার ঘরে এল। দিনেন চক্রবর্তীর পুকুরের মাছ। অবিবাহিত ছ'ফুট দুই, দশাসই, প্রাণ প্রাচুর্যের ভরা হৈচৈয়ে লোক। বয়স মধ্য চল্লিশে। দুটো সিনেমা হল, গোটা পাঁচেক ট্রাক আর বাসের মালিক। বছরে একবার শিকারে বেরোত বিহারে বা উড়িষ্যায়। চিতার থাবায় বাঁ কাঁধ বরাবরের জন্য জখম হওয়ার পর পশু শিকারের বদলে শুরু করেছে মাছ শিকার। কলকাতা ছেড়ে বারুইপুরে নন্দার বাগানের পাশেই বাড়ি আর পুকুর কিনে একজোড়া কুকুর নিয়ে বছরচারেক বসবাস করছে। লোকটিকে অরবিন্দর ভাল লাগে। সবল, জান্তব এবং বাসনায় আসক্ত শিশুর মত। তারা

ওখানে গেলেই দিনেন তাদের বাড়িতে হাজির হয়। নন্দা মাঝে মাঝে দিনেনের হুইল দিয়ে মাছ ধরতে বসে।

আঙুলে লাগা তেল চুলে মুছে নিয়ে জামা খুলে প্যান্টের বেল্ট আলগা করতে করতে অরবিন্দর মনে এল হিপ পকেটে মোড়কটা রয়েছে। বিব্রত বোধ করল। দু'আঙুলে ধরে সেটি বার করে তাকিয়ে রইল। ভাবল যা লেখা রয়েছে তা কি সত্যি? করোনারি থ্রম্বসিস বলেই কি মনে হবে? কিন্তু এটার তো দরকার হবে না, নন্দাকে ছেড়ে সে চলে যাবেই। যেখানে সেখানে ফেলে দেয়া ঠিক নয়, দুর্ঘটনা ঘটতে পারে ভেবে সে টেবিল থেকে স্ক্রিপ্টের খাতাটা তুলে সন্তর্পণে তার মধ্যে মোড়কটা রাখল।

শোবার ঘরটা অন্ধকার। মৃদু বেড লাইট জ্বালাবার আগে সে প্যান্ট ছেড়ে পাজামা পরে নিল। নন্দা উপুড় হয়ে দু'হাতে বালিশ জড়িয়ে ঘুমোচ্ছে, যেভাবে সাঁতার না জানা মানুষ জলে কাঠের টুকরো আঁকড়ে ধরে। গায়ের পাতলা চাদরটা হাঁটু পর্যন্ত উঠে রয়েছে। বিছানার ধারে ছোট্ট টেবিলের উপর একটা চকোলেট তার নিচে একটা কাগজ।

অরবিন্দ ঝুঁকে দেখল নন্দার হাতের লেখায় 'অরো চকোলেটটা খেও আর চিঠিটা পড়ো।'

অরবিন্দ চকোলেট মুখে পুরে চিঠি হাতে খাটে বসল।

গদিটা একটু বসে যাওয়াতেই বোধহয় নন্দা নড়ে উঠে বিড়বিড় করে কি বলল।

অরবিন্দ মৃদুস্বরে বলল, আমি অরো।

নন্দা পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। চিঠিটা পড়তে শুরু করল অরবিন্দ ঃ

অরো,

এখন ফাল্গুন মাস। আমাদের বিয়ের আর একটা বছর শেষ হবে। আর একটা বছর শুরু হবে। কি এনে দেবে আগামী বছর আমার জন্য? তোমার জন্য আমি আনব ভালবাসা। তুমি কখনো বলোনি, কিন্তু আমি জানি যে ভালবাসা তুমি অন্তর থেকে চাও আমি তা দিতে পারিনি। আমি চেষ্টা করি অরো, আমি চেষ্টা করি। আমি সুখী, এই কথাটাই তোমাকে শুধু জানাতে চাই। কাল তোমার জন্য মাছের মুড়ো দিয়ে দুটো রান্না করব।

তোমার নন্দা

চিঠিটা ভাঁজ করে পুরিয়ার আকার হতে সে খাটের নিচে ছুঁড়ে দিয়ে ভাবল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোথাও যেতেই হবে। নয়তো দুর্বল হয়ে পড়ব।

আলো নিভিয়ে সন্তর্পণে নন্দার পাশে শুয়ে অরবিন্দ অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল। নন্দার ঘুম আবার ব্যাহত হল। ঘুমঘোরেই সে চাদরের মধ্য থেকে হাত বাড়িয়ে খুঁজতে লাগল অরবিন্দর হাত। অবশেষে কনুইটি পেয়ে, যেন তাই যথেষ্ট এমনভাবে, আঁকড়ে ধরল এবং ঘুমিয়ে পড়ল।

অরবিন্দ শক্ত নিথর হয়ে শুয়ে। সেই পুরনো ভয়, যন্ত্রণা, এলোমেলোবোধ তাকে চেপে ধরছে। একটু পরেই ভয় ও যন্ত্রণাটা মিলিয়ে গেল, রইল শুধু এলোমেলো বোধ! সেটা ক্রমশ মাথার মধ্যে জমাট বেঁধে একটা মার্বেলের মত গড়াতে শুরু করল। সে চাইছে ওটা গড়াতে থাকুক। যতক্ষণ এলোমেলো থাকবে তার চিন্তা, ততক্ষণ সে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। সিদ্ধান্তে না এলে কোন কাজেও হাত দিতে পারবে না। এবং কাজে নামলেই নিরাপদে থাকা যাবে।

কিন্তু মানসিক এলোমেলো ব্যাপারটাও এক সময় মিলিয়ে গেল, অরবিন্দ অবশ্য জানতো মিলিয়ে যাবেই।

অবশেষে রুঢ় সত্যের মুখোমুখি তাকে হত হল। নন্দা ঘুমের ভান করে তার বাহু ধরেনি। সত্যিই সে ঘুমিয়ে আছে। তার মনের চারভাগের তিনভাগ অন্তত ঘুমে মগ্ন! নিছকই সহজাত। ক্রিয়াবসে নন্দা এটা করেছে। হাতড়ে হাতড়ে সে যেভাবে খুঁজে নিয়ে কনুই আঁকড়ে ধরল, তাতেই পুলিশের সঙ্গে যা কিছু কাল্পনিক যুক্তিতর্ক ফেঁদেছিল, সব অরবিন্দর মন থেকে মুছে গেল।

আগে যেখানে ছিল, তার থেকেও ভয়ঙ্কর জায়গায় সে এখন হাজির হয়েছে। আর কোন পথ নেই। নন্দার এই হাতটাকে অনেক অনেক দূরে, ধরাছোঁয়ার বাইরে পাঠাতেই হবে। এই হাতটা ফিসফিস করে বলে যাচ্ছে– চাই, তোমাকে চাই। অরো, তুমি আমাকে যতোটা কঠিন, স্বনির্ভর ভাবো আমি কিন্তু তা নই। যেমনভাবে ভালবাসা চাও, হয়তো সেভাবে বাসতে পারি না, কিন্তু তোমাকেই আমি চাই। তুমি যখন ফিরে আসো আমি মনে মনে ভীষণ খুশি হই। একা থাকতে আমার একটুও ভাল লাগে না। একা থাকলেই আমি কি রকম ভীতু হয়ে যাই, অসুখী বোধ করি। অরো, তুমি আমার কাছে ফিরো, আমার কাছেই থেকো। আমি যথাসাধ্য করব। আমাকে ছেড়ো না। তাহলে নিজেকে নিঃসঙ্গ বোধ করব, মনের মধ্যে শীত বাসা বাঁধবে।

অরবিন্দ কাঠের মত শুয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে। নন্দার মুঠোয় ধরা তার হাত। সে তখন ব্যর্থ যুদ্ধটা চালিয়ে যাচ্ছে ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়া মমতার সঙ্গে। একবার সে গুটি-গুটি চেষ্টা করে হাতটা ছাড়িয়ে নিতে। ঘুমের মধ্যেই বুঝতে পেরে নন্দা আরো জোরে আঁকড়ে ধরে। অরবিন্দ হাতটা একইভাবে রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে রইল। তখন তার মনের মধ্যে ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে উঠতে লাগল একটি সিদ্ধান্ত, কাজটা এবার করতেই হবে।

ভোররাতে ঠান্ডার মাত্রাটা বাড়ে। তাকে ধরে থাকা হাতটা ক্রমশ ঠান্ডা হয়ে আসছে। মৃতা নারীর হাতের মত কিংবা মৃত্যুর খুব কাছাকাছি এসে যাওয়া কোন নারীর হাতের মত।

বহুক্ষণ আগেই থিয়েটার হল থেকে চিরো বেরিয়ে যেত, যদি না স্টেজে চিত্রা থাকতো। যখনই চিত্রা চোখের সামনে এসেছে সে উত্তেজনা বোধ করেছে। ওর হাঁটা, বসা, ঘুরে দাঁড়ানো, হাত নাড়া প্রতিটি ভঙ্গিতে সে মাদকতা পাচ্ছিল। চিত্রার কণ্ঠস্বরের অনুরণনে, তার স্নায়ুকোষগুলি ভরে আছে। যখন স্টেজে চিত্রার ভূমিকা থাকে না চোখ বন্ধ করে একটু আগে দেখা চিত্রা এবং তার অভিনয় মনের মধ্যে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে। কি নাটক অভিনীত হচ্ছে তা সে জানে না, জানার ইচ্ছাও নেই। চিৎকার করে অভিনয় হচ্ছে, ব্যতিক্রম শুধু চিত্রা। প্রগতিশীল বিষয়, বাবার অসুখ, দুর্ঘটনায় পঙ্গু ভাই, মাতাল স্বামী- দেখতে দেখতে বিরক্তিতে ভরে গেছে চিরো। পরিবারের অবিবাহিতা মেয়ে চিত্রা। ওকে কুড়ি বছরের একদিনও বেশি মনে হচ্ছে না, মুখেও তাজা সারল্য।

নাটকটি কিভাবে শেষ হবে, মাঝামাঝি সময় থেকেই চিরো সেটা বুঝে গেছে। অবশেষে সেভাবেই সমাপ্তি ঘটল। সংসারের দুর্দশা ঘোচাতে অর্থাৎ ভাইয়ের চাকরি, বাবার চিকিৎসার জন্য চিত্রাকে দেহ দিতে হল বৃদ্ধ ধনী ভিলেনকে।

নাটক শেষ হবার মিনিট পাঁচেক পর সিগারেটটা জুতোয় পিষে, চিরো এগোল গ্রীনরুমে যাবার জন্য। দরজায় আটকালো একজন।

‘চিত্রা ঘটকের সঙ্গে দেখা করব।’

‘দাঁড়ান, খবর দি। কি নাম বলব?’

চিরো ইতস্তত করে বলল, ‘বলুন, অরো দেখা করতে চায়।’

দু’মিনিটের মধ্যে চিত্রাই বেরিয়ে এল ব্যস্তভাবে।

‘ওমা আপনি।’

‘অবাক করে দেব বলে, অরোর নামটা করেছি।’

‘সত্যিই অবাক হয়েছি। অরো কখনো আমার অভিনয় দেখতে তো আসে না।’

‘তাহলে দু’টো অবাক পেলেন। দ্বিতীয়টা, আমায় দেখে।’

চিত্রা মাথা হেলাল।

'আপনার তো এখানকার পাট চুকে গেলো, চলুন পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'রঙচঙ তুলি আগে।'

'কিছু তোলার নেই। একদম ন্যাচারাল মেক আপ। তাড়াতাড়ি করুন, ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে। আগে কোথাও গিয়ে কিছু খেয়ে নিতে হবে।'

চিত্রার বাড়ি দমদমে শ্রীপুর কলোনীতে, এ তথ্য অরোর কাছ থেকেই কথায় কথায় চিরো জেনে নিয়েছে। ঔৎসুক্য না দেখিয়ে সে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'চিত্রা থাকে কোথায়?'

'দমদম, শ্রীপুর নামে একটি কলোনীতে। চমৎকার জায়গাটা। ছোট্ট দোতলা বাড়ি, ওর বাবাই করে গেছেন।

'বাবা নেই?'

'বছর দশেক আগে মারা গেছেন, ক্যান্সারে।'

'আচ্ছা ভিআইপি রোড দিয়ে এয়ারপোর্টের দিকে যেতে একটা সাইনপোস্ট দেখেছি বাঁদিকে, সেটাই কি?'

'অরোর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। চিত্রার কলোনীর সাইনপোস্ট চিরো যে দেখেছে এতেই ওর সুখ। বেচারা বোকা অরো। এত সহজে ওকে ধোঁকা দেওয়া যায়।

মুখের মেকআপ তুলে চিত্রা বেরিয়ে এল। চিরো তার গাড়ির সামনের দরজা খুলে ধরতেই চিত্রা হেসে বলল, 'আপনি আসবেন জানলে টিকিট পাঠিয়ে দিতাম।'

'জানিয়ে এলে, এত ভাল অভিনয় করতে পারতেন না।'

'ভাল করেছি নাকি?'

দরজা বন্ধ করে ঘুরে এসে ড্রাইভিং সীটে বসে স্টার্ট দেবার আগে চিরো বলল, 'এবার থেকে, যেখানে আপনার অভিনয় থাকবে দেখতে যাব।' কথাটা বলে তার মনে হল একবিন্দুও বাড়িয়ে বলেনি সে।

পার্কস্ট্রীটে ছিমছাম ছোট্ট 'ব্লু মুন'-এ ওরা মুখোমুখি বসল। এখানে মদ পাওয়া যায় না। চিরো সেজন্যেই জায়গাটা বেছেছে। মদ এবং চরিত্রহীনতাকে মেয়েরা খুব কাছাকাছি ব্যাপার মনে করে। চিত্রার দৃষ্টি থেকে মদ যতটা দূরে সরিয়ে রাখা যায় ততই ভাল। চিরোর সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলার সময় অন্তত চরিত্রহীন শব্দটা ওর মনে আসবে না। যথেষ্ট ভেবে-চিন্তেই চিরো ফন্দি এঁটেছে। চিত্রাকে তার ভাল লেগেছে। ইউরোপ ঘুরে আসা ছাপাখানা ব্যবসায়ী, কিছুটা উন্নাসিক চিরো নিজেই অবাক হয়ে যায়; একবার দেখাতেই কেন সে ওর প্রেমে পড়ল!

লোকেদের উপর চিত্রা সম্পর্কে যেসব প্রতিক্রিয়া হয়, চিরোর ধারণা, তার একটি হল– হয় সে মনে কোন ছাপই ফেলে না, অথবা একটি সাক্ষাতেই এমন করে দিতে পারে যার ফলে অন্য কিছু আর ভাবা যায় না। চিত্রা ছাড়া এই ক'দিন চিরো আর কিছু ভাবেনি। অবশেষে সে স্থির করেছে, যেভাবেই হোক ওকে সে বিয়ে করবেই। চিরোকে তার মস্তিষ্ক জানিয়ে দিয়েছে, চিত্রা নবীনা নয়, কালিদাসের কোন নায়িকাকেই সে রূপে হারাতে পারবে না, এমনকি অসাধারণ রসবোধেরও অধিকারিনী নয়। কিন্তু তার ইন্দ্রিয় জানিয়েছে, এ পর্যন্ত যত সব রমণীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছে তার মধ্যে একমাত্র চিত্রাকেই সে মনেপ্রাণে বিয়ে করতে চাইল। অযৌক্তিক, হাস্যকর মনে হলেও, সে জানে এজন্য অরোর সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটবেই এবং চিরো তাতেও প্রস্তুত।

খাদ্য নির্বাচন নিয়ে ওরা ছেলেমানুষী করল না। চিরোই বলল, 'চীনে খাবারই বলি। যতই খান, শরীরকে গোলমালে ফেলে না, দিব্যি হজম হয়। তাছাড়া কম খরচে অনেকটা পাওয়া যায়।'

সে ভেবেই রেখেছিল। চীনা খাবার রান্নাঘর থেকে টেবিলে আসতে অনেক সময় নেয়, তাতে কিছুটা বাড়তি সঙ্গ সে পাবে। কম খরচের কথাটা ইচ্ছা করেই বলেছে। উড়নচন্ডেলেকে মেয়েরা স্বামী হিসাবে পছন্দ করে না। বড়মানুষী দেখালে মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত মেয়েরা কুঁকড়ে যায়। সিরিয়াস, হিসেবি লোকের মত তাকে কথা

বলতে হবে। নিজের সম্পর্কে বেশি কথা বলা বোকামি। অনেক লোক মেয়েদের মনে দাগ কাটার জন্য নিজেদের কথাই জাঁকিয়ে বলে। মেয়েদের কিছুক্ষণ ভাল লাগে শুনতে, তারপর ব্যাজার হয়।

ওয়েটারকে বরাদ্দ দিয়ে চিরো বলল, 'রাত হয়ে গেলে মা নিশ্চয় ভাববেন।'

'আমার বেশি রাতে ফেরায় মা অভ্যস্ত।'

'বাবা থাকলে বোধহয় থিয়েটার করা-টরা চলত না।'

'বলা শক্ত।' অঙ্কের অধ্যাপক ছিলেন, প্রিন্সিপল মেনে চলতে চাইতেন, কিছু কিছু গোঁড়ামিও ছিল। কিন্তু অভাবে, অসুখে, পোষ্যদের কথা ভেবে, শেষদিকে দেখেছি ওনার অনেক প্রিন্সিপলই শিথিল হয়ে যাচ্ছিল।'

চিরোর মনে হয়, আলোচনাটা অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া উচিত। তাই আচমকা বলল, 'আপনি এমএ পরীক্ষাটা তো দিতে পারেন।'

চিত্রা অকৃত্রিম অবাক হলো। চিরো লক্ষ্য করল ওর চোখ দুটি আকর্ষণীয়, ভীষণভাবে সম্মোহনকারী। সারামুখে চামড়া আর পেশী লাবণ্য ছড়িয়ে দিয়েছে ভাঁজে ভাঁজে। এমন মুখ মধ্যবয়সে এমনকি বার্ধক্যেও সুন্দর দেখাবে।

'আমি?'

হেসে ফেলল চিত্রা। চিরো এটাই চেয়েছিল।

'কখনো ভাবিনি। বোধহয় দরকার হয়নি। মেজ বোনটা ফিলজফিতে পাস করে এখন কাঁথিতে একটা স্কুলে আছে।'

'বিয়ে দেবেন না?'

'দিতে কি আর হয়, করে নেবে। বরং বিয়ে দিতে হবে পরেরটিকে। লেখাপড়ায় সাধারণ, দেখতে শুনতেও। ও আর ছোট ভাইটা, এই দুজনই আমার দুশ্চিন্তা।'

'ভাই কি পড়ে?'

'হায়ার-সেকেন্ডারী। পাস করতে পারবে কিনা আমার সন্দেহ আছে। সাত-আট দিন আগে আঙুল ভেঙেছে ক্রিকেট খেলতে গিয়ে। তার ক'দিন আগে হাঁটুতে চোট পেল চলন্ত বাসে উঠতে গিয়ে পিছলে পড়ে।'

চিরো লক্ষ্য করে যাচ্ছে চিত্রার মুখ। পরিবারের কথা বলার সময় উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগ সত্ত্বেও মুখটিতে কোন ফাটল ধরছে না।

'এই বয়সটাই এরকম'। নিজের মুখের দিকে আঙুল তুলে চিরো বলল, 'দাগগুলো এখনো রয়েছে।'

চিত্রা যখন তার গালে কপালে থুতনিতে চোখ বোলাচ্ছে, চিরো তখন পূর্ণদৃষ্টিতে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে। চিত্রার সঙ্গে চোখাচোখি হল। এই প্রথম দীর্ঘক্ষণ, একবার শ্বাস টেনে ত্যাগ করার মত সময় ধরে ওরা কথা না বলে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল।

চিরোই চোখ সরিয়ে, টেবিলের উপর রাখা চিত্রার হাতব্যাগটা নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করে বলল, 'পাসটা আগে করুক, তারপর নয় আমার কাছে রেখে প্রেসের কাজ শেখার ব্যবস্থা করব।'

কথাটা বলেই সে চোখ তুলল এবং আবার সরিয়ে নিল। কারণ ওর মাথার মধ্যে তখন একটা কুচক্রী কণ্ঠ ফিসফিসিয়ে বলে চলেছে– চিরো বাড়াবাড়ি করো না। যেন না মনে কর তুমি ওর সঙ্গে ধাষ্টামো করতে চাও। অনুগ্রহ দান করে, যেন মনে না করে তুমি নেকড়ে চরিত্রের। তাহলে কিন্তু ও পালাবে। ধীরে, অতি ধীরে এগোও।

'তা যদি হয়, ওর একটা হিল্লে হলে আমি বেঁচে যাই।'

কণ্ঠস্বর চিরোকে জানিয়ে দিল, চিত্রা জালে ধরা দিচ্ছে। সে বুঝতে পারছে চিত্রার দরকার একজন অভিভাবক। সংসারের জন্য ও জীবনের সেরা সময়ের অনেকটাই খরচ করেছে। এখন চাইছে ভরসা করার মত সঙ্গী। ও ক্লান্ত, বিশ্রাম পেতে চায়। অরো? মনে মনে হাসল চিরো, বিশ্রাম পেতে হলে টাকা চাই। অরোর টাকা কোথায়? নন্দাকে ডিভোর্স করলে মাসোহারা দিতে হবে। দেবার পর চিত্রাকে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখার মত টাকা কোথায়! যথেষ্ট রোজগার ওর নেই। চিত্রাকে থিয়েটার করে যেতেই হবে। অরো শুধুই স্বপ্ন দেখে। চিরো ভাবল, যদি স্বপ্নই দেখতাম তাহলে এতবড় ব্যবসা গড়ে তুলতে পারতাম না। মেয়েরা চায়, পোক্ত বাস্তববাদী স্বামী।

'ওর জন্য আপনি ভাববেন না। লেখাপড়ায় আমি প্রচণ্ড ফাঁকিবাজ ছিলাম। এখনো যথেষ্টই মুখ্যু। তবে–'

চিরো হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ওয়েটারকে খাবারের প্লেট হাতে আসতে দেখে। আর একটু হলেই সে নিজের প্রশংসা শুরু করে দিয়েছিল।

ওরা যতক্ষণ ব্লু মুন-এ ছিল একবারও অরোর নাম উল্লেখ করেনি। গাড়িতে উঠে মিনিট তিনেক পর চিত্রাই প্রথম অরো প্রসঙ্গ তুলল। সোজা প্রশ্ন।

'আচ্ছা অরোর ব্যাপারটা কি বলতে পারেন? ওর স্ত্রীর সঙ্গে গোলমালটা কোথায়?'

যেন এখুনি কারুর গাড়িচাপা পড়ার কথা আছে, তাই সন্তর্পণে রাস্তার দু'ধারে তাকাতে তাকাতে চিরো সময় নিল উত্তরটা ভেবে নিতে।

'সবাই বলবে কোন গোলমাল নেই। কিন্তু আছে।'

'দোষটা কার?'

'কারুরই নয়।'

চিরো ধরেই নিল, দোষটা যে নন্দারই, সে বিষয়ে চিত্রার মনে সন্দেহ নেই। অরো নিশ্চয় ভালবাসা বঞ্চিত স্বামীর ভূমিকায় সুযোগ্য অভিনয় করে গেছে চিত্রার কাছে। কিন্তু সে যে অনুমানে ভুল করেছে, এটা বুঝল চিত্রার পরের কথায়।

'অরোও তাই বলে। দোষটা কারুরই নয়'। এরপর ইতস্ততঃ করে সে যোগ করল, 'অরোর গোলমালটা হল, সুখের জন্য ও নির্ভর করে আবেগের উপর। আর এমন একজনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, সে জাগতিক ব্যাপারে সব কিছু দখলে রাখার ওপরে নির্ভর করে। মানুষ হিসাবে দুজনেই ভাল।'

'এটাই ট্রাজেডি।'

'অরোর গোলমালটা হল, এমন কাউকে কখনো পায়নি যে ওকে ভালবাসা দিতে পারে।'

'কখনো, নাকি এ পর্যন্ত?' চিরো মুখ ফিরিয়ে চিত্রার দিকে তাকাল।

'আপনাকে ও দারুণ ভালবাসে আর যতদূর মনে হয় আপনিও ওকে, ঠিক?'

'এখনো জানি না।'

'সে কি!' চিরোর অবিমিশ্র বিস্ময়তার কণ্ঠস্বরে একটু জোর দিয়েই প্রকাশ পেল। 'আমি তো জানি আপনারা গভীরভাবে মগ্ন, একে অপরকে ছাড়া চলবে না।'

চিত্রা সামনে রাস্তার দিকে তাকিয়ে নিরুত্তর রইল। চিরো অপেক্ষা করতে করতে ভাবল, অরোর জীবনে যে দুটি মেয়ে এসেছে, একটি ব্যাপারে তাদের মধ্যে মিল আছে... কেউই মিথ্যা কথা বলতে পারে না।

'মুশকিলটা হল,' অবশেষে চিত্রা বলল, 'মেয়েদের প্রয়োজনটা শুধু ভালবাসা পাওয়ারই নয়, দেওয়ারও। অরো আমাকে ভালবাসে, আমাকে ওর দরকার। কিন্তু কেন যে, সেটাই বুঝছি না। যাই হোক, ওর ভালবাসাকে স্বীকার করে নিয়েছি। আমাকে ভালবাসার জন্য ওর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

চিত্রা কথা বলল না। চিরো আবার বলল, ধীর ও স্পষ্ট স্বরে,

‘ওর ধারণা, আপনি ওকে ভালবাসেন।’

চিত্রা এবারও কথা বলল না। চিরো ইচ্ছে করেই ওর দিকে আর তাকাল না। এই কথা নিয়ে চাপ দিয়ে ওকে প্রতিহত করে তুলতে তার ইচ্ছে করছে না। বরং সহানুভূতিতেই সে আচ্ছন্ন হচ্ছে। চিত্রা এখন নিজের মনকে যাচাই করার চেষ্টা করে চলেছে। বেচারা এখন কষ্টের মধ্যে রয়েছে। তার ইচ্ছা করছে বলতে, আমায় তুমি বুঝিয়ে বলতে চেয়ো না চিত্রা, আমি এসব বুঝি।

কিন্তু তার বদলে চিরোর মাথার হিসেবি দিকটা মতলব ভাঁজতে শুরু করল। অত্যন্ত মৃদু এবং কোমল স্বরে সে বলল, ‘অরোর সঙ্গে জীবন শুরু করার পক্ষে, মনে হয় না কৃতজ্ঞতা খুব একটা পোক্ত বুনিয়াদ হবে। ওর চাহিদাটা আরো বেশি।’

‘অরো বেশিই তাহলে পাবে।’

তীক্ষ্ণ, দ্রুত জবাব দিল চিত্রা। সঙ্গে সঙ্গে চিরো কুঁকড়ে পিছিয়ে গিয়ে বলল, ‘নিশ্চয়ই, বেশিই পাবে।’

‘মানুষটাকে আমি ভালবাসি, এটা আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। আমি ওকে দেখব, যত্ন করব, ও দেখবে আমায়। আমি চাই ওকে স্নেহ-মমতা, ভালবাসা দিতে! মনে হয় আঘাত পেয়েছে, স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে, তা থেকে ওকে সারিয়ে তুলতে চাই।’

ঈর্ষার ছুরি চিরোর বুকে বিঁধে তাকে যন্ত্রণায় কাঁপিয়ে দিচ্ছে। তবু যতটা সম্ভব উৎফুল্ল স্বরে সে বলল, ‘আমার তো মনে হয় আপনি তা পারবেন।’

‘ওকে বিয়ে করব ঠিক করে কি ভুল করেছি?’

‘আপনার বিবেক বিচার করার অধিকারী আমি নই। আর এ কথাটা বলছি অরোর বিয়ের কথা ভেবে নয়। অরোর কথা ভেবেই, সেই সঙ্গে আপনারও।’

‘আমি ওকে সুখী করতে পারব। অন্ততঃ এখন যতটা সুখী তার থেকে বেশিই পারব। মানুষটা এত ভাল।’ চিত্রা প্রায় বিষণ্নকণ্ঠে বলল, ‘আমি ওকে সুখী দেখতে চাই।’

বুকের মধ্যে টনটন করল চিরোর। অরোকে তারও ভালবাসতে ইচ্ছে করে কিন্তু আজকের অরোকে নয়। স্কুলের সেই তাড়া-খাওয়া অসহায় অরো, ছুটির পর স্কুল ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে থাকা শুকনো মুখ ছেলেটির কথা ভাবলেই চিরো দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু এখন এ ধরনের চিন্তাকে বেশিক্ষণ প্রশ্রয় দিতে সে রাজি নয়।

‘আমার দিকে তাকিয়ে বলুন তো, অরোকে কি আপনি ভালবেসেছেন?’

চিত্রা মুখ ফিরিয়ে বলল, ‘এ প্রশ্ন কেন?’

‘যা জানতে চেয়েছি আগে তাই বলুন, আপনি কি অরোকে ভালবেসেছেন?’

চিত্রা ইতস্ততঃ করছে। সেই মুহূর্তে চিরো সন্দেহের ক্ষুদ্র বীজটি চিত্রার উর্বর কোমল হৃদয়ে আলতো করে ফেলল এই আশায়, যদি তা থেকে কোনদিন ফল ফলে।

খুবই হালকা চালে, আপন মনে চিরো বলল, ‘আসলে নন্দা ওকে ভালবাসে না বললে ভুল বলা হবে। নিজস্ব ধরনের নিশ্চয়ই সে অরোকে ভালবাসে। তাই ভয় হয়, আঘাতটা খুব জোরেই পাবে বোধহয়। অরো যা করতে যাচ্ছে, আমি হলে কিছুতেই তা করতে পারব না।’

এরপর চিত্রাকে কিছুটা বিষণ্ন মনে হল চিরোর। পথনির্দেশ দেবার জন্য সে বেশি কথা বলল না। কলোনী বললেই মাটির সরু রাস্তা, একতলা চালাবাড়ির যে দৃশ্য চোখে ভেসে ওঠে শ্রীপুর আদৌ তা নয়। চওড়া পীচ রাস্তা, পার্ক, দীঘি এবং আধুনিক নকশার দোতলা-তিনতলা বাড়িতে ভরা এলাকাটিতে যে রাস্তায় চিত্রাদের বাড়ি সেখানে গাড়ি ঢোকার আগেই চিত্রা থামাতে বলল।

‘গাড়ি ঘোরাবার জায়গা নেই আমাদের এই রাস্তাটায়। আমি হেঁটেই যাই বরং, ওইতো সামনেই বাড়ি।’

চিরোও নেমে ওর সঙ্গে হাঁটতে শুরু করল।

‘এত রাতে আপনাকে আর বসতে বলব না, আর একদিন বিকেলে বরং আসুন। চা-এর নেমন্তন্ন রইল।’

‘চা! আমার মত খাইয়ে লোক শুধু চা-বিস্কুট খেতে এতদূর আসবে?’

‘বেশ তাহলে দুপুরেই নয় আসুন।’

‘কবে?’

‘জানাব খন।’

‘কি করে? আমার ঠিকানা কি, ফোন নাম্বারটা তো জানেন না।’ ব্যাগ থেকে কার্ড বার করে চিত্রার হাতে দিয়ে চিরো বলল, ‘আপনার তো ফোন নেই, তাহলে জানব কি করে কবে আপনার অভিনয় আছে?’

‘সামনের বাড়িতে ফোন আছে। ভাল লোক ওরা, ডেকে দেয়। দিন কলমটা।’

অন্ধকারেই চিরোর আর একটা কার্ডের পিছনে চিত্রা ফোন নাম্বারটা লিখে দিল। সেই সময় চিরোর ইচ্ছা করছিল ওকে ভীষণভাবে বুকে জড়িয়ে ধরতে, ওর দুই ঠোঁটের কোমলতা নিজের ঠোঁটে, ওর দেহের উষ্ণ কমনীয়তা নিজের দেহে অনুভব করতে।

কিন্তু কুচক্রী কণ্ঠস্বরটি মাথার মধ্যে ফিসফিসিয়ে বলল– বাড়াবাড়ি কোরো না। নেকড়ে হয়ো না। ধৈর্য ধরো, তাহলেই সফল হবে।

বিদায় নিয়ে, লোহার ছোট্ট গেটটা খুলে চিত্রা ভিতরের আঙ্গিনায় ঢুকল। চিরো অন্ধকার রাস্তায় দাঁড়িয়ে। সম্ভবত ওর মা-ই দরজা খুললেন। দরজা বন্ধ হল। কিছুক্ষণ পর দোতলার ঘরে আলো জ্বলে উঠল।

চিরো নিজের সঙ্গে তর্ক করতে করতে ফিরল। বারবার সে নিজেকে বোঝাল– কিছু লোক ভণ্ডামী করার জন্যই জন্মায়, আমিও তাই। অরোর সঙ্গে বন্ধুত্ব ছুটে যাবে, যাক। আমি অবিবাহিত; অরো বিবাহিত। চমৎকার একটি ভাল বৌ ওর আছে। যে কোন সাধারণ লোক নন্দার মত বৌ পেলে বর্তে যাবে। তাছাড়া এই ধরনের আঘাত পাবার মত কোন অপরাধই নন্দা করেনি।

অরো যেসব যুক্তি দেখিয়েছে সেগুলোকে সে এক কথায় বাতিল করে দিল– অরো যদি নিজের বৌয়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, তাহলে আমিই বা কি এমন অপরাধ করব যদি চিত্রাকে দখল করি!

চিরো শিস দিতে দিতে গাড়ি চালিয়ে ফিরল।

চিত্রার কাছ থেকে চিঠি বা টেলিফোন পাবার জন্য সাতদিন অপেক্ষা করল। কোন সাড়া-শব্দ এল না। ঈর্ষায় দগ্ধ হতে লাগল এই ভেবে যে, চিত্রা প্রতিদিনই অরোর সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করছে। মনের মধ্যে সে নানা রকম ছবি দেখতে লাগল ঃ অরো জড়িয়ে ধরছে চিত্রাকে অ্যাডভয়েসের নির্জন স্টুডিয়ো ঘরে। অরোর কাঁধে মাথা রেখে চিত্রা হাঁটছে নির্জন ময়দানের উপর দিয়ে রাত্রে কিংবা বেঞ্চে বসে আছে হাতে হাত রেখে। অরো চুমু খাচ্ছে আর তাতে সাড়া দিচ্ছে চিত্রার ঠোঁট। অরো দু’হাতে চিত্রাকে জড়িয়ে কানে কানে বলছে, সে কত ভালবাসে।

যদিও চিরো জানে, ঈর্ষা জন্মায় ভয় বা আত্মবিশ্বাসের অভাব বা অনিরাপত্তাবোধ থাকে, কিন্তু চিত্রার ব্যাপারে সে নিজের ওপর দারুণভাবে আস্থাবান। তা সত্ত্বেও সে ঈর্ষার তীব্র জ্বালায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। অরোর চৌকে, চওড়া মুখটা মনে পড়লেই সে এখন বিরক্তিতে ভরে যায়, অথচ আগে মজাই পেত। চিত্রার ঠোঁটের উপর ওর শুকনো পাংশু ঠোঁট চেপে রয়েছে কল্পনা করলেই চিরো ছটফট করে ওঠে বোবা যন্ত্রণায়।

দুদিন সে সন্ধ্যায়, অ্যাডভয়েস থেকে শ’খানেক গজ দূরে গাড়িতে বসে অপেক্ষা করেছে ঠায় তাকিয়ে থেকে।

দু'দিনই সে অরোকে একা বেরিয়ে এসে বাসে উঠতে দেখে। হয়তো চিত্রার সঙ্গে দেখা করতে কোথাও নামতে পারে ভেবে বাসটাকে সে অনুসরণ করছে। অরো বাড়ি ঢুকছে দেখে তবেই ফিরেছে।

অবশেষে শনিবার সকালে চিরো টেলিফোন করল চিত্রার দেওয়া নম্বরে। ডেকে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে মিনিট তিনেক অপেক্ষা করার পর ওধার থেকে যে কণ্ঠটি ভেসে এল, শুনেই চিরো বুঝল সম্ভবত চিত্রার বোন।

'চিত্রা আছেন?'

'দিদি তো আজই ভোরে বার্নপুর গেছে, ওখানে ওদের শো আছে আজ।'

'কালই ফিরবেন কি?'

'ঠিক জানি না।'

'এলে বলবেন চিরো ফোন করেছিল। নামটা মনে থাকবে তো?'

ফোন রেখে চিরো ভাবল, নন্দার সঙ্গে গল্প করে ওর হাতের রান্না খেয়ে, রাজি হলে ওকে নিয়ে সিনেমা দেখে আজ সারাদিন কাটাবে। আর সুবিধা পেলে বাজিয়ে দেখবে অরোর সঙ্গে তার সম্পর্কটা এখন কেমন।

যথারীতি দরজা খুলল মতি। চিরোকে দেখে একগাল হেসে বলল, 'কেউ নেই আজ।'

'ব্যাপার কি, গেল কোথায়?'

'এক সঙ্গেই ভোরে দু'জন বেরিয়েছে। দিদি শেয়ালদা স্টেশন, বারুইপুর যাবে বলে; দাদা হাওড়া স্টেশন বার্নপুর যাবে বলে।'

'অরো বার্নপুরে, কেন?'

'বন্ধুর অসুখ, দেখতে গেছে।'

শোনামাত্রই প্রচণ্ড বজ্রাঘাতে চিরোর শরীরের অভ্যন্তর খাক হয়ে গেল। কিছুক্ষণ সে মতির মুখের দিকে চুপ করে তাকিয়ে রইল।

'চা খাবেন?'

চিরো কিছু না বলে, ভিতরে ঢুকে বসবার ঘরে এসে চেয়ারে বসল। মাথার মধ্যে একটা কথাই তালগোল পাকাচ্ছে ঃ চিত্রা আর অরো দুজনেই একসঙ্গে বার্নপুর গেছে। ওখানে অরোর কোন বন্ধু আছে বলে কখনো সে শোনেনি। এটা মিছে কথা, তবে চিত্রার হয়তো শো আছে। ওর সঙ্গে সময় কাটাবার জন্যই অরো গেছে। অনেকগুলো ঘণ্টা ওরা একসঙ্গে থাকতে পারবে। হয়তো একঘরেও থাকবে।

'কফি করে দেবো?'

চিরো মাথা হেলাল। মতি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে সে অন্যমনস্কের মত টেবিলের একটা খাতার পাতাগুলো ওল্টাল। কয়েক পাতা উল্টিয়ে বন্ধ করার সময় দেখল একটা সেলোফেন খাম। খাতাটা বন্ধ করে সে ভাবল, এই মুহূর্তে কোন ট্রেন আছে কিনা বার্নপুর যাবার।

কিন্তু সেখানে গিয়ে সে কি করবে? ওরা দু'জন তাকে দেখে অবাক হবে ঠিক, কিন্তু বার্নপুরে আসার কি কারণ সে দর্শাবে? ব্যবসার কাজে এসেছি? খবর পেলাম চিত্রা এখানে অভিনয় করবে তাই চলে এলুম? অরো ভাবতে পারে, চিত্রার অভিনয় দেখার জন্য চিরোর এত মাথাব্যথা কেন? চিত্রা কি বিরক্ত হবে? অরোর সঙ্গে নিবিড় সান্নিধ্যে বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ার জন্য চটতে পারে।

মতি কফি এনে দিল। কাপটা নিয়ে চিরো জানতে চাইল, 'অরো কবে ফিরবে, কাল?'

'তেমন কিছু তো বলে যায়নি। ফিরলেও ফিরতে পারে। তবে দিদি কাল বারুইপুরে থাকবে। এখন মাছ ধরার দরুণ নেশায় পেয়ে বসেছে। দিনেন বাবুর পুকুরে প্রায়ই ছিপ নিয়ে বসছে।'

'তাইতো', চিন্তিত স্বরে চিরো বলল, 'ভাবলুম সারাদিন এখানে আড্ডা দেব, তা আর হল না। কি করি বলতো?'

'সারাদিন তাহলে ঘুমোন, বিকেলে সিনেমায় যাবেন।'

'ধুৎ, দিনে ঘুমোন অভ্যাস নেই।'

'তাহলে এধার-ওধার বেড়ান। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করুন।'

'হুঁ।'

চিরো কপি শেষ করে উঠে দাঁড়াল। 'বরং বারুইপুর থেকে ঘুরে আসি।'

'যদি যানতো, দিদির ওষুধটা তাহলে নিয়ে যান। ভুল করে ফেলে রেখে গেছে। রোজ রাতে খাওয়ার অভ্যেস।'

মতি দ্রুত বেরিয়ে গেল এবং ফিরে এল সাদা প্লাস্টিকের একটা কৌটা হাতে। চিরো সেটা নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নামটা পড়ল।

'সিকোজাইম। হজমি গুঁড়ো।'

চিরো বারুইপুর পৌঁছল একটা নাগাদ। বাগানটা পাঁচিল ঘেরা। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে তৈরী মানুষ সমান উঁচু পাঁচিল বহু জায়গায় ভেঙে পড়েছে। টিনের চাদরে মোড়া বিরাট গেটটা বন্ধ ভেতর থেকে। গাড়ি থেকে নেমে, চিরো পাঁচিলের ধার দিয়ে হেঁটে, একটা ভাঙা জায়গা পেল। সেখান থেকে সে ভিতরের বাগানে ঢুকল। গেটে ভিতর থেকে তালা দেওয়া। পেঁপে আর পেয়ারা গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে একতলা বাংলোর সদর দরজাটা দেখা যাচ্ছে।

দরজাটা বন্ধ। তার পাশে দুটো জানলাও। নন্দা কি কোথাও গেছে? চিরোর মনে পড়ল, ইদানিং দিনেনের পুকুরে নাকি প্রায়ই সে ছিপ নিয়ে বসছে। দিনেন লোকটাকে মন্দ লাগে না তার। প্রাচুর্যে ভরা ওর সবকিছুই– বিত্ত, চিত্ত এবং স্বাস্থ্য। এগুলো ব্যবহারেও কার্পণ্য করে না। বন্ধুত্বপরায়ণ অথচ নিঃসঙ্গ।

রোদ্দুরের ঝাঁঝ এড়াতে সে একটা পেয়ারা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল। নিস্তব্ধতা, গাছপালা, মাটির গন্ধ আর বহুদূর পর্যন্ত দেখার মত আকাশ ধীরে ধীরে চিরোকে কিছুক্ষণের জন্য ভুলিয়ে দিল অরো এবং চিত্রার কথা। ঝিরঝিরে বাতাস বুক ভরে টানতে টানতে সে ভাবল, কলকাতার বাইরে একটা বাড়ি করলে কেমন হয়!

দূরে একটা গরু ডাকল, তারপরই একটা ঘুঘু। চিরো সিগারেট ফেলে বাংলোর দিকে এগোল। কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে টালি-ঢাকা বারান্দা। বারান্দাটা ঘুরে পিছন দিকে উঠোনে যাবার আর একটা ছোট দরজায় শেষ হয়েছে। বড় বড় সেকেলে খড়খড়ির জানলা বারান্দার উপর।

চিরোর পায়ে রাবার সোলের চটি। শব্দ হয় না। সবক'টা খড়খড়ি বন্ধ, শুধু একটির একটি পাল্লা মাত্র খোলা। ওটা বসার ঘর। হয়তো যোগেন মালি ভিতরে আছে। দরজা খুলে দেবার জন্য ওকে ডাকার উদ্দেশ্যে জানালাটার কাছাকাছি এসেই চিরো থমকে পড়ল। ঘরের ভিতর যা তার চোখে পড়ল, তা দেখার জন্য সে আদৌ তৈরী ছিল না। যে ঝাঁকুনি সে পেল তার উৎস, খুন বা নিষ্ঠুর নির্যাতন ধরনের কিছু দেখার ফল নয়। তবে বড় রকমের ধাক্কাই সে পেল।

তার মনে হল, গাড়ি থেকে নেমে ভাঙ্গা পাঁচিল দিয়ে ভিতরে না এসে গেটটা খুলে দেবার জন্য যোগেনকে ডাকতে হর্ণ-বাজানো উচিত ছিল। তার মনে হল এই চটিটা না পরে চামড়ার ভারী গোড়ালির জুতোটা পরে এলেই ভাল হত। তার মনে হল, আজ বারুইপুরে না এলে ভাল হত।

জানালার সঙ্গে কোনাচে করে রাখা একটা বড় সেটি। তাতে নন্দা বসে। তার দু'হাত বেড়ি দিয়ে রয়েছে একটি লোকের গলা। লোকটির ঠোঁট চেপে রয়েছে তার ঠোঁট। লোকটি ঝুঁকে মুখ নামিয়ে রয়েছে। ঘরের মধ্যে আবছা আলো-আঁধার। কয়েক সেকেন্ড, তারপরই অজানা কোন কারণে দিনেন হঠাৎ মুখ তুলল এবং চিরোকে দেখতে পেল।

দিনেন অস্ফুটে কি বলল নন্দাকে। সিধে হয়ে মাথার চুলে হাত বোলাল বিন্যস্ত করতে। নন্দা চমকে উঠে খাড়া হয়ে বসল এবং সেও চুলে হাত রাখল।

চিরো প্রায় ছিটকে সরে গেছে জানালাটা থেকে। ভেবে পাচ্ছে না এবার সে কি করবে। ভাবল, জায়গাটা ছেড়ে চটপট গাড়িতে উঠে চলে যাই। যেন কিছুই দেখিনি, এমন ভাব দেখিয়ে অন্য কোনদিন ওদের সঙ্গে দেখা করে কথা বলব।

হয়তো সে তাই করত। কিন্তু ইতস্তত করাকালে আবছাভাবে তার মনে হল, এটাকে হয়তো সে পরে কাজে লাগাতে পারবে।

চিরো মন্থর গতিতে পিছনের দরজার দিকে এগোল, ওদের সামনে ওঠার সময় দিয়ে। ওরা কি বলে, কি করে প্রথমে সে তাই দেখতে চায়। যদি ওরা কিছু না বলে, তাহলে সেও এ সম্পর্কে উচ্চবাচ্য করবে না; অন্তত এখনকার মত।

পিছনের দরজার কাছে পৌঁছাবার আগেই সামনের দরজা খুলে দিনেন চেঁচিয়ে বলল, 'আরে চিরোবাবু যে!'

চিরো ঘুরে দাঁড়িয়ে কণ্ঠে যথাসাধ্য বিস্ময় ফুটিয়ে বলল, 'আরে দিনেনবাবু আপনি! এই তো গাড়ি থেকে নেমে ঢুকছি। ভাবলাম, যাই অরো আর নন্দার সঙ্গে আড্ডা দিয়ে খানিকটা টাটকা বাতাস ফুসফুসে ভরে আসি।'

'গাড়িতে এসেছেন, কই আওয়াজ পেলাম না তো! ঠেলে আনলেন নাকি !' ছোট্ট তির্যক হাসলো দিনেন- 'এই দিকে আসুন।'

চিরো সামনের দরজা দিয়ে বসার ঘরে এল।

নন্দা ঘরের প্রান্তে দাঁড়িয়ে, পিছন ফিরে তাকে রাখা ম্যাগাজিনগুলো গোছাচ্ছে। পরনে বেল-বটম আর শার্ট। চিরো ওর শরীরকে তারিফ করল মনে মনে। সে লক্ষ্য করল, ইতিমধ্যেই সেটিতে হেলান দেবার বালিশগুলো ফাঁপিয়ে সাজিয়ে রাখা, নন্দার চুল এবং পোশাকও পরিপাটি। একমাত্র মেয়েরাই পারে অবিশ্বাস্য দ্রুততায়, দু-এক মিনিটের মধ্যে এইসব কাজগুলো সেরে ফেলতে।

'তোমাদের ফ্ল্যাটে গিয়ে শুনলাম, এখানে এসেছ। ভাবলাম যাই একটা রাত কলকাতার বাইরে কাটিয়ে ফুসফুসটা পরিষ্কার করে আসি।'

নন্দা ঘুরে দাঁড়িয়ে চিরোর চোখে চোখ রাখল সহজভাবে, মুখে মৃদু হাসি, তাতে আতিথ্য দেবার সম্মতি। শুধু চিবুকটা অযথা উদ্ধত ভঙ্গিতে একটু তোলা।

'ভালই তো। থাকো না আজ রাতটা।'

এরপর ওরা স্বাভাবিক মানুষের মত কথাবার্তা বলার চেষ্টা শুরু করল।

'বেশ গরম পড়ে গেছে।' চিরো বলল।

'কলকাতায় তো এখানকার থেকে বেশি গরম মনে হয়।' নন্দা বলল।

'কালবোশেখির মত একটা ব্যাপার পরশু হয়েও হল না।'

দিনেন বলল।

'এবার পল্যুশনের খবরটা দেখছেন? কলকাতার লোকেরা যে কি করে এখনো বেঁচে আছে বুঝছি না। ভাবতে পারেন চৌরঙ্গীর বাতাসেই নাকি বিষাক্ত গ্যাস সব থেকে বেশি।' চিরো বলল।

'কার্বন মনোক্সাইড ওখানেই বেশি জমবে; লরি, বাস, প্রাইভেট কারের ভিড় ওখানেই বেশি, নিউইয়র্কের থেকেও বেশি।' নন্দা বলল।

'নিউইয়র্কের থেকে বেশি কিছুতেই নয়।' দিনেন আপত্তি জানাল।

আসলে কার্বুরেটর, সিলিন্ডার, পিস্টন, রিং কিছুই তো আমরা প্রপারলি রাখি না, ওভারহল করাই না, ভেঙ্গে গেলেও বদলাই না। সুতরাং গাড়ি কম হওয়া সত্ত্বেও ধোঁয়া বেশি হবেই। এসব ব্যাপারে সাহেবরা পাক্কা। গত মাসে আমার একটা লরির সাইলেন্সার ফেটে বিদঘুটে শব্দ করতে শুরু করে। বসিয়ে দিয়েছিলাম। মানুষের কানের স্বাস্থ্যরক্ষার কথাটা তো অবশ্যই আমাকে ভাবতে হবে।'

'কিন্তু কতকগুলো ক্ষেত্রে ইচ্ছা থাকলেও মানুষ নিরুপায়। যেমন কয়লার উনুন। কলকাতার আবহাওয়া সব থেকে পল্যুট করে কয়লা। আমাদের বাগবাজারের বাড়িতে এক সঙ্গে দুটো উনুনে যখন আঁচ পড়ে কি অবস্থা হয় বলুন তো? কিন্তু গ্যাস কোথায় যে কয়লার উনুন তুলে দেব? গেরস্তর পয়সা কোথায় গ্যাস নেবার?' চিরো বলল।

'ওহ্ চিরো, চা খাবে?' নন্দা জিজ্ঞাসা করল।

'অবশ্যই। তবে শুধু আমার জন্য কষ্ট করতে হলে, দরকার নেই।'

'পেলে আমিও এক কাপ নেব।' দিনেন বলল। 'দু'কাপেও আপত্তি নেই।'

নন্দা ঘর থেকে বেরোচ্ছে, চিরো বলল, 'স্নান আগে করব। কাপড়-জামা কিছু আনিনি।'

'অরোর দু-একটা পাজামা আছে, হবে না তোমার?'

'যা মোটা হয়ে গেছি।' বলতে বলতে চিরো উঠল এবং নন্দার সঙ্গেই সে ঘর থেকে বেরোল।

'তোমার জন্য মতি পাঠিয়েছে।' চিরো প্লাস্টিকের কৌটাটা পকেট থেকে বার করে এগিয়ে ধরল।

অবাক হয়ে তারপর হাসল নন্দা। 'সকালে একবার মনে পড়েছিল। ভেবেছিলুম এখান থেকেই কিনে নেব। তোমার ঘরটা খুলে দিচ্ছি। যোগেন বোধহয় ঘুমোচ্ছে, ওকে জল দিতে বলছি বাথরুমে।'

পর পর তিনটে শোবার ঘর। নন্দারা এলে থাকে দক্ষিণ প্রান্তটিতে। চিরোর জন্য সে খুলে দিল উত্তরেরটি। মাঝে রইল একটি ফাঁকা ঘর। ঘরে ঢুকেই চিরো খাটে চিৎ হয়ে শুয়ে বলল, 'আগে একটু গড়িয়ে নিই।'

কিছুক্ষণ পর সে রান্নাঘরের দিক থেকে নন্দা ও দিনেনের চাপা গলায় কথা বলার শব্দ পেল। চিরো চোখ বুজে ভাবল, ওরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে নিক। পরে ওদের তো ঝঞ্ঝাটের মধ্যে পড়তে হবে।

মিনিট কুড়ি পরে স্নান সেরে চিরো বসার ঘরে এল। নন্দা ও দিনেন সেটিতে পাশাপাশি বসে। প্লেটে কিছু বিস্কুট, নন্দার হাতেও। চা ভিজছে পটে। পটটা চিরোর দিকে এগিয়ে দিল দিনেন। নন্দা চা ঢালতে শুরু করল।

মিনিট দুয়েক কেউই কথা বলল না। চিরোর মনে হল, ওরা ব্যাপারটা নিয়ে কিছু বলবে। তা না হলে এতক্ষণে কলকাতার আবহাওয়া জাতীয় আজেবাজে কথা শুরু করে দিত। ওদের মধ্যে কে শুরু করবে, চিরো সেই অপেক্ষায় রইল।

দিনেনই শুরু করল। চা শেষ করে, রুমালে মুখ মুছে, বিরাট দেহটা চিরোর দিকে ঘুরিয়ে বলল, 'আপনি জেনেই গেছেন ব্যাপারটা অর্থাৎ আমাদের সম্পর্কটা।'

'কি সম্পর্ক?'

'নন্দা আর আমার মধ্যের সম্পর্ক।'

ইতস্তত করে চিরো বলল, 'হ্যাঁ, অনুমান করছি।'

দিনেন অনুমোদন জানিয়ে মাথা নাড়ল। নন্দা তার কোলে রাখা হাতের নখ পরীক্ষায় ব্যস্ত।

'শুধু দেখে যতটুকু বোঝা যায় ততটুকুই। কিন্তু দেখা থেকেই যে এসব ব্যাপার বোঝা যায় তা তো নয়। আমি দেখেছি নন্দাকে আপনি চুমু খাচ্ছেন। ব্যাপার বলতে এটাই তো বোঝাতে চাইছেন?'

'হ্যাঁ, ঠিক এটাই বোঝাতে চাই।'

‘বেশ, কিন্তু এ নিয়ে মাথা ঘামাবার আমার প্রয়োজনটা কি ?’

চিরো বলে চলল, ‘নন্দা আমার বৌ নয়, সুতরাং, এই নিয়ে গোলমাল তৈরী করার কোন দায়ও আমার নেই। বিবাহিতা স্ত্রী অন্যের সঙ্গে প্রেম করছে, পৃথিবীতে নন্দাই সেটা প্রথম দেখাল না।’

ওরা দুজনেই কথা বলল না।

‘আমার দিক থেকে এটুকুই বলতে পারি’ চিরো তার বক্তব্য শেষ করল, ‘আমি কিছুই দেখিনি। ঘরটা আধা-অন্ধকার ছিল, ভুলও দেখতে পারি। সুতরাং কল্পনার বশবর্তী হয়ে গল্প তৈরী করে চাউর করার কোন ইচ্ছেও আমার নেই।’

চিরোর মনে হল, মোটামুটি সে শোভন অবস্থায় ব্যাপারটাকে রাখতে পেরেছে।

কিন্তু নন্দা এত সহজে ছাড়া পাওয়াটা পছন্দ করতে পারল না। সে সোজাসুজি বলল, ‘প্রেম করা নয় এটা, আমি দিনেনকে ভালবেসেছি, দিনেনও আমাকে ভালবেসেছে। এটাই হচ্ছে ব্যাপার।’

পশ্চিম আকাশ থেকে লাল আভা জানালা দিয়ে নন্দার চুলে পড়েছে। সেই আলোতেই তার শুভ্র গাত্রবর্ণ গোলাপী হয়ে উঠেছে। নন্দাকে এখন মনমাতানো সুন্দরী মনে হচ্ছে চিরোর। ওর ভঙ্গিতে লজ্জার ছিটে-ফোঁটা নেই। কণ্ঠস্বরে কম্পনের রেশ নেই। অথচ ওকে নির্লজ্জ বললে অন্যায় বলা হবে। তেজী সাহসী মেয়ে, স্বচ্ছভাবে চিন্তা করে। একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, সেটার মুখোমুখি হবার জন্য সে তৈরী হয়ে রয়েছে।

‘এটাই হচ্ছে ব্যাপার।’ নন্দা আবার বলল চিরোকে চুপ করে থাকতে দেখে।

‘তুমি কি নিশ্চিত হয়ে গেছো?’

‘নিশ্চিত।’ দিনেন একটু জোর দিয়ে শক্ত গলায় বলল।

‘একেবারে।’ নন্দা বলল।

‘ডিভোর্স?’

চিরো সোজা তাকাল নন্দার দিকে। চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল সেটির উপর দিনেনের আঙুল নন্দার আঙুল স্পর্শ করল। তার থেকেই চিরো বুঝল বিষয়টা নিয়ে ভালভাবেই আলোচনা হয়ে গেছে।

নন্দা মাথা নাড়ল। ‘না, ডিভোর্স নয়।’

‘না! কখনো না?’ চিরো বলল।

‘কখনো না। যখন বুঝব অরোর আমাকে দরকার নেই- তাহলে তখন করবো। কিন্তু আমাকে ছাড়া যে ওর চলবে না, চিরো সেটাও তুমি জানো। কাজকর্মের দিক থেকেও ব্যর্থ ফেইলিওর, মনে হয় না কিছু করতে পারবে।’

ঝুঁকে একটা বিস্কুট তুলে নিয়ে নন্দা আবার বলল, ‘এখনো ওকে আমার ভাল লাগে। আমি ছেড়ে গেলে ও যে কি করবে সেটা ভাবতেই পারি না।’

‘তোমার কি মনে হয় অরো আত্মহত্যা করবে?’

‘অতোটা আমি ভাবি না।’

‘তাহলে কি ভাবো?’

নন্দা অসহায় অধৈর্যে হাত নাড়ল। ‘জানি না। হয়তো মদ খাওয়া ধরবে। কাজকর্ম চলে যাবে। ধার-দেনায় জড়িয়ে পড়বে কিংবা অশিক্ষিত নোংরা কোন মেয়ে মানুষের পাল্লায় পড়ে অধঃপাতে যাবে।’

‘দিনেন বাবুর কি মনে হয় ?’ চিরো বিচারকের মত গম্ভীর মুখে যেন অপর কৌঁসুলির বক্তব্য জানতে চাইল।

তার ধারণা, দিনেন বিরোধিতা করবে নন্দার।

'নন্দাই ওকে সব থেকে ভাল জানে!' ধীরস্বরে দিনেন বলল। 'ও মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে, ওকে ছাড়া অরবিন্দ ভেঙ্গে পড়বে। হয়তো ঠিকই। ভদ্রলোক জীবনটাকে বড় বেশি গোমড়া মুখে দেখেন।'

চিরোর বুকের মধ্যে অসম্ভব গতিতে এখন দপদপানি শুরু হয়েছে। মাত্র কয়েকটা বাক্য ব্যয় করে সে এই দু'জনের বিবেককে শান্ত করে দিতে পারে। মনের গ্লানি, উদ্বেগ, অস্বস্তি দূর করে দিতে পারে। দুজনকে পশ্চিম বাংলার সুখীতম নাগরিকে রূপান্তরিত করতে পারে এবং সেই সঙ্গে অরোর সমস্যাটারও সমাধান করে দিতে পারে।

'আমার খুব কষ্ট হয় ওর জন্য।' নন্দা হঠাৎ কথা বলা শুরু করল। 'খুব বেশিদিন আগে নয়, অরো গভীর রাতে ফিরল খুব ক্লান্ত হয়ে। ঠান্ডাও পড়েছিল সে রাতে। ওর জন্য একটা চিঠি লিখে রেখে দিয়েছিলাম আর একটা চকোলেট। ইদানীং ওকে দেখছি কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে, সেটা কাটাবার জন্যই চিঠিটা। আধো ঘুমের মধ্যে দেখলাম ও চিঠিটা পড়ল। তারপর শুলো। আমি হাত বাড়িয়ে ওর হাত ধরলাম, তারপর ও ঘুমিয়ে পড়লো। কি ঠান্ডা আর ক্লান্ত হয়ে যে ও ফিরেছিল! নিঃসঙ্গ ফ্ল্যাটে নির্জন ঘরে ওকে যে ফিরতে হয়নি, এতে আমি খুশি, সত্যিই খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু ডিভোর্স করলে তখন কি হবে?'

'খাটেন খুবই, কিন্তু ব্যবসার মাথা নেই।' দিনেন বলল। 'ওর উচিত কোথাও চাকরি নেওয়া। সকলের সব জিনিস হয় না।'

'বড় বিনীত, বড় ভদ্র। যদি ও কাজের ক্ষেত্রে বড় হতো, প্রচুর টাকা আয় করতো, তাহলে আমি ডিভোর্স করতাম।' নন্দা বলল।

'যা মনে হচ্ছে, তাতে ডিভোর্স তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না।' দিনেন মৃদু হাসলেও কণ্ঠস্বর তিক্ততায় ভরা। 'কি বিচিত্র পরিহাস, ভদ্রলোক কাজের ক্ষেত্রে ব্যর্থ, আর সেটাই তাকে জিতিয়ে দিল স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষায়!'

দিনেনের হতাশা কারুরই কান এড়াল না। নন্দা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করল।

চিরো ইতিমধ্যেই ঠিক করে ফেলেছে, অরো এবং চিত্রার সম্পর্কটা এখন যে অবস্থায় সেটা এদের কাছে প্রকাশ করবে না। অরো যদি নন্দার কাছ থেকে মুক্তি পায় তাহলে চিরো হারাবে চিত্রাকে। এবং চিত্রাকে হারাবার কোন ইচ্ছাই তার নেই।

সহৃদয় অরো এক্ষেত্রে ব্যাপারটাকে যে ফাঁস করে দিত তাতে চিরোর সন্দেহ নেই। কিন্তু অরো জীবনের সবক্ষেত্রেই ব্যর্থ, সে তো নয়। সুতরাং সে বেশিক্ষণ ইতস্তত করল না।

ধীর গম্ভীর এবং কিছুটা বিমর্ষ স্বরে, যেন গভীরভাবে চিন্তা করে, যত অপ্রিয়ই হোক সিদ্ধান্তটা জানাতেই হবে, এমন এক পারিবারিক সুহৃদের মত, নিরপেক্ষ ও উদার ভঙ্গিতে চিরো বলল, 'আমার মতামতটা কি জানাবো?' এবং ওরা উত্তর দেবার আগেই সে বলল, 'আমার মনে হয়, নন্দাই ঠিক।'

নন্দা অতি দ্রুত ঝলকে চিরোর দিকে তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিল। মুহূর্তের সেই চাহনির মধ্যে চিরো যেন যন্ত্রণার স্ফুলিঙ্গ নন্দার চোখের আড়ালে দেখতে পেল। হয়তো ও আশা করেছিল, যত কথা বলেছে, যত যুক্তি দিয়েছে, চিরো সেগুলো পাল্টা যুক্তিতে খন্ডন করবে। করলে সে রেহাই পেত।

চিরোর আরো মনে হল, খানিকটা মরীয়াভাবও যেন সে দেখেছে। যেন আশা করার মত যতটুকু ছিল, তাও আর এখন নেই। চিরো মনে মনে দুঃখ পেল, কিন্তু তার দ্বারা আবেগে আচ্ছন্ন হল না।

'আমার মনে হয় নন্দা ছাড়া অরোর এক মুহূর্তও চলবে না। ও ঠিকই আন্দাজ করেছে, অরো তার দুঃখ-যন্ত্রণা ভুলতে কিছু একটা করবেই, হয়তো মদ ধরবে। আর কাজকর্মও নষ্ট করবে।'

নন্দা বলল, 'ধন্যবাদ চিরো, মুখ ফুটে কথা ক'টা বলার জন্য।' দিনেন এবার মুখ খুলল। 'আবার বিয়ে করতে পারে, এটা কি মনে হয় না?'

ওর গলায় যেন জরুরী তাগিদ অনুভব করল চিরো। শেষবারের মত মরীয়া আবেদন। বেচারা!

'না তা মনে হয় না'। চিরো সাবধানে তার যুক্তি পেশ করল। 'মনে হয় না আবার প্রেমে পড়বে। ওকে আমি ছোটবেলা থেকেই চিনি তো।'

চিরো উঠে গিয়ে জানলার কাছে দাঁড়াল। সন্ধ্যা নেমে আসছে। পাখিদের কিচিরমিচির পুরোদমে চলছে। তার মনে হল, অরো এখন চিত্রাকে নিয়ে বার্নপুরের রাস্তায় বেড়াচ্ছে। চমৎকার নির্জন একটা বিরাট পার্ক আছে বার্নপুরের অদূরে। সেখানে কি অরোকে জড়িয়ে শরীরে শরীর লাগিয়ে চিত্রা হাঁটছে এখন! অরোর একটি হাত তার কাঁধে। নবীন প্রেমিক-প্রেমিকার মত আশপাশের লোককে ওরা গ্রাহ্য করছে না। অরো ভারী গম্ভীর গলায় ভালবাসার কথা বলতে বলতে চিত্রার বাহু আঁকড়ে ধরছে। নিরালা নির্জন জায়গায় এলেই অরো ঝুঁকে চিত্রার ঘাড়ে, বাহুতে বা বুকে চুমু খেয়ে নিচ্ছে।

ঈর্ষা আবার আক্রমণ করছে চিরোকে। প্যান্টের পকেটে তার দুই মুঠো শক্ত হয়ে উঠল। ঘুরে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'আমার মনে হয় না আবার বিয়ে করার কোনরকম সুযোগ অরোর আছে।'

চিরোর উত্তেজিত চড়া গলা শুনে ওরা দু'জন ভাবল, অরোর ভালমন্দর কথা ভাবতে ভাবতে সে মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে।

পরদিন ভোরের ট্রেনেই কলকাতা থেকে অরো বারুইপুর এসে পৌঁছল। বার্নপুরে সে দুপুরের কয়েক ঘণ্টা মাত্র ছিল।

চিরো খালিগায়ে জানলায় দাঁড়িয়ে। বসন্ত চলে গিয়ে গ্রীষ্ম এসে গেছে এই রকম একটা অনুভূতি মাখানো খুবই সাধারণ সকাল। তবে কলকাতায় এত হালকা সোনার মত রোদ, এত উজ্জ্বল এবং জ্বালাহীন এমন সকাল থাকে না। অল্পক্ষণের মধ্যেই কলকাতা চিড়চিড় করে ওঠে। ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে। চিরো কয়েকবার দীর্ঘশ্বাস টানলো। গায়ের চামড়ার উপর দিয়ে বাতাস কেটে চলেছে। অদ্ভুত সিরসিরানি লাগছে তার, যেন এইমাত্র মালিশ করা হয়েছে তাকে। এমন তাজা ঝরঝরে বোধটা বহুদিন সে পায়নি।

রবিবারের সকাল। ঢিলেঢালা, আলসেমিতে ভরা। সারা বাড়িটা নিঝুম। নন্দা বোধহয় রান্নাঘরে। বাসনের শব্দ আসছে।

একটা শালিক বাগানে নামল। লাফাতে লাফাতে এগিয়ে থমকালো। মাটি থেকে খুঁটে খেল, সম্ভবত পোকা।

অতি মন্থরগতিতে বুড়ো আসছে রান্নাঘরের দরজা লক্ষ্য করে। মাথাটা নামানো। এখানকারই সব থেকে বয়স্ক কুকুর। গায়ের লোম অনেক ঝরে গেছে, চোখে ছানি পড়ে প্রায় অন্ধ। যোগেনের কাছেই থাকে। বয়সের জন্যই নন্দা ওকে বুড়ো নাম দিয়েছে। নাম ধরে ডাকলে বুঝতে পারে। নন্দারা এলে সারাক্ষণ রান্নাঘরের আশেপাশেই থাকে। বেশিরভাগ সময়ই ঘুমিয়ে কাটায়।

বুড়ো বাগানে একবার থামল। আড়মোড়া ভাঙ্গতে সামনের পা-জোড়া এগিয়ে ডন দিল। পিছনের পা দুটি টানটান করে হাই তুলল। শালিকটা হাঁটতে হাঁটতে ওর পাঁচ হাত সামনে দিয়ে চলে গেল গ্রাহ্য না করে। সম্ভবত জেনে গেছে, বুড়োর শরীরে লাফ দিয়ে শিকার ধরার তাগদ আর নেই।

মাটিতে নাক নামিয়ে কি যেন শুকে, বুড়ো মুখ তুলে সূর্যের দিকে তাকাল। মাথা ঝাঁকাল। যেন বুঝতে চাইছে, যে গরম তার লাগছে সেটা ওখান থেকেই নেমে আসছে কিনা।

চিরো নিচু গলায় ডাকল, 'বুড়ো!'

কুকুরটি শুনতে পেল না। চিরো এবার জোরে ডাকল, 'অ্যাই বুড়ো'! বুড়ো মাথা ঘুরিয়ে, ছানিপড়া চোখ তুলে তাকাল। ল্যাজটি বারকয়েক নাড়ালো। তারপর মন্থরচালে পিছনের দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

বহু মানুষ জীবনে দেখা হয়ে গেছে, আর দরকার নেই, এমন এক ভঙ্গি তার চলনে ফুটে রয়েছে। যোগেনের

আরো কয়েকটি কুকুর আছে, তাদের সঙ্গে বুড়োর বনে না। চিরোর মনে হল, বুড়োর বোধশক্তির অর্ধেকেই অসাড় হয়ে গেছে। এখন ওর দিনরাত মানে– হয় গরম এবং আরাম, নয়তো ঠান্ডা আর কষ্ট, হয় ভরাপেট আর তৃপ্তি, নয়তো ক্ষুধা আর ছটফটানি।

চিরো ভাবল, মানুষও কি অনেকটা কুকুরের মত নয়! কিন্তু মানুষের যে স্মৃতি রয়েছে। সেটা মানুষকে মজা দেয়, সুখ দেয়, কিংবা অত্যাচার করে, কষ্ট দেয়। স্মৃতি একটা ভাল-মন্দ মেশানো ব্যাপার। পুরনো ঘা সময়ের প্রলেপে সেরে যায় কিন্তু কুৎসিতগুলো সারে না। কল্পনার ঘসা খেয়ে বরং শুধু জ্বালা করে। জানোয়ারদের এসব জ্বালা-যন্ত্রণা নেই। আশা-নিরাশা, ভয়-ভাবনার বালাই নেই। খুব সহজভাবেই ওরা মরে। পাতের এঁটোকাঁটা খেয়ে সান্ত্বনা একমাত্র এরাই পায়।

চিরো স্নান সেরে পিছনের দালানে এসে দেখল নন্দা আর অরো তার জন্য খাওয়ার টেবিলে অপেক্ষা করছে। দু'জনে ভাগাভাগি করে খবরের কাগজ পড়ায় ব্যস্ত। টেবিলে টোস্ট, কলা আর পোচ।

ওরা কেউই দু'চারটির বেশি কথা বলল না। চিরো বুঝল, ওরা দু'জনেই সচেতন, সে তাদের গোপন কথার অংশীদার। চিরো সচেতন, ওরা দু'জন নিজেদের মনোভাব পরস্পরের কাছে যেন না ব্যক্ত করে! দু'জনের মধ্যে নন্দাকেই তার সুন্দর চরিত্রের মনে হয়। ভাল না বেসে বিয়ে করলেও, সে দাম্পত্য সম্পর্ক ভাঙতে চায় না, বোঝা-পড়া করে রাখতে চায় আর সেজন্য মানসিক কষ্ট ভোগ করতেও রাজি। অরো তা নয়। চিরো জানে যদি না সে বাধা দিয়ে বন্ধ করায় তাহলে অরো দাম্পত্য সম্পর্ক ভেঙ্গে দেবেই এবং চিত্রাকে বিয়ে করবে।

চিরো ভাবল এক্ষেত্রে দুদিকে দুটো কাজ করতে হবে। নন্দা আর দিনেনের ব্যাপারটায় দেখতে হবে নন্দার যেন অরো সম্পর্কে সহানুভূতি, মমতা, করুণাবোধ ক্রমশ বাড়ে আর চিত্রার সঙ্গে দেখা করে তার মনে এই ধারণাটা পোক্ত করান দরকার যে নন্দার কাছ থেকে অরোকে সরিয়ে নেওয়াটা অন্যায় হবে।

দিনেন গোটা দশেক কই মাছ পাঠিয়ে দিয়েছে সকালেই। দৈর্ঘ্যে এক একটি প্রায় এক বিঘৎ। যোগেনের বছর বারো বয়সী মেয়েটি উঠোনে ছাড়ানো মাছগুলোর কানকোয় ভর দিয়ে চলাফেরা সামলাচ্ছে একটা কাঠের সাহায্যে। বুড়ো সামনের পা ছড়িয়ে বসে বন্ধ চোখ মাঝে মাঝে খুলে একবার নন্দা, আর একবার মাছগুলোর দিকে তাকাচ্ছে। আর দু'টি কুকুর খিড়কি দরজার কাছে বসে।

'মাছগুলো মারা এক সমস্যা, নয়তো মেয়েটা কুটতে পারবে না।' নন্দা চিন্তিত স্বরে বলল।

চিরো বলল, 'তেল-কই হোক আজ, দারুণ ঝাল দিয়ে কি বলিস?'

'যা খুশি হোক। আমার শুধু ডাল-ভাতেও আপত্তি নেই।' এই বলে অরো কাগজে মন দিল।

নন্দা রান্নাঘরে গিয়ে কোমরে অ্যাপ্রণ জড়িয়ে এল। হাতে কয়লা ভাঙ্গার লোহার ডান্ডাটা।

চিরো বলল, 'কি হবে ওটা দিয়ে?'

'পিটিয়ে পিটিয়ে না মারলে, কুটবে কি করে?'

উঠোনে পড়ে থাকা থলিটায় মাছগুলো ভরার জন্য চিরো মেয়েটিকে বলল। তারপর উঠোনে নেমে এসে থলিটার মুখ জড়ো করে মুঠোয় ধরে আছড়াতে শুরু করল মাটিতে। বুড়ো ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল।

নন্দা হেসে উঠল।

'বিনা রক্তপাতে খুন।'

'এতে খুনীর বিবেক কিছুটা পরিষ্কার থাকে', চিরো আছাড় মারতে মারতে বলল। 'ম্যাকবেথের মত রক্তের কথা ভেবে তাহলে আর আঁতকে উঠতে হবে না।'

মুখ তুলে সে দেখল অরো বাড়ির ভিতরে চলে যাচ্ছে। চেঁচিয়ে সে বলল, 'অরো চললি কোথায়?'

'বাগানে যাচ্ছি, যোগেন শশাগাছের মাচা তৈরী করছে।'

চিরো হেসে নন্দাকে বলল, ‘চিরকালটাই ও এই রকম। নিষ্ঠুরতা, রক্ত, যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে না।’

নন্দা বলল, ‘সেটা যে অন্যের যন্ত্রণার কারণ হয়।’ তারপর উঠোনে পড়ে থাকা নিথর মাছগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, ‘বঁটি নিয়ে আয় খুকি।’

‘তোমাদের সম্পর্কে কাল রাতেও অনেকক্ষণ ভেবেছি।’

নন্দা ফিরে তাকাল চিরোর দিকে। তার চোখে প্রত্যাশা, হয়তো তার সমস্যা সমাধানের জন্য চিরো কিছু নৈতিক সহায়তা দিতে পারবে।

‘তোমরা দু’জন, দিনেন বাবু আর তুমি, আমার ধারণা সুখীই হবে। কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আর একজনকে অসুখী করে, তোমরা তা হতে পারবে কিনা।’

‘না, তা হওয়া সম্ভব নয়। তুমি ঠিকই বলেছ।’

খুকি বঁটি নিয়ে এসে পড়ায় চিরো উত্তর দিতে গিয়ে থমকে গেল। সে দালানে উঠে এসে চেয়ারে বসল, তার সঙ্গে সঙ্গে এল নন্দাও।

‘আঁশ ছাড়া আগে।’ নন্দা নির্দেশ দিল এবং তাকাল চিরোর দিকে।

‘কিছু লোক আছে হয়তো পারে, কিন্তু তুমি সুখী হতে পারবে না। তোমার মত বিবেকসম্পন্ন মেয়ের সাধ্য নয়।’

কপাল থেকে চুলগুলো পিছনে সরাতে লাগল নন্দা। মুখ লাল হয়ে উঠেছে, নিচের ঠোঁট কাঁপছে। আঙুল দিয়ে সে চোখ কচকাল।

‘আমার কি মনে হয় জান, যদি তোমরা সুখী হবে বুঝতাম, তাহলে বলতাম অরোকে ত্যাগই করো।’

নন্দা কথা বলল না। একদৃষ্টে মাছের আঁশ ছাড়ানো দেখতে লাগল।

চিরো আবার বলল, ‘দিনেন হয়তো সুখী হবে, কিন্তু তুমি হবে না। সারাক্ষণ তুমি অরোর কথাই ভাববে, সবকিছু তেতো হয়ে যাবে। এমনকি হয়তো দিনেনের সঙ্গে সম্পর্কটাও।’

নন্দা হাসবার চেষ্টা করল। চোখে টলটল করছে জল। কাঁপা ঠোঁটে হাসবার চেষ্টা করে সে মাথা নাড়ল।

মুহূর্তের জন্য চিরোর মন বেদনায় ভরে গেল। সেটা নন্দার মনোকষ্টেতে নয়, তার নিজেরই বদমাইশিতে। বিবাহিতা নারীর পক্ষে যতদূর সম্ভব বড় লোভের মুখোমুখি এই নারী। কিন্তু কর্তব্য সম্পর্কে, ন্যায় ও অন্যায় সম্পর্কে ওর নিজস্ব ধারণা এত গভীর যে লোভ দমনের লড়াইয়ে জিতে গেছে।

চিরো হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে, কিছু না বলে, বাইরের বারান্দায় এসে পায়চারী শুরু করল। আমি যা করছি সেটা জঘন্য, চিরো অস্থিরভাবে বিড়বিড় করল, অন্যায় করছি নন্দার উপর। ওকে কি এখন বলব, যেসব কথা বলছি ঠিক তার উল্টোটি তোমার করা উচিত। কিন্তু এ-কথা ওর কাছে গিয়ে বলতে পারব না। নিজেকে যতটা শক্ত ভাবি ততটা আমি নই।

চিরো ভেবে দেখল, তিনটি মানুষকে সে সুখী করার ক্ষমতা রাখে। যত সুখী তারা জীবনে হচ্ছে তার থেকেও বেশি। আর একজনকে পারে মোটামুটি সুখী করতে। কিন্তু নির্দয় মানুষদের ক্ষেত্রে প্রায়শই যা হয়, প্রচন্ড আবেগ ফুঁসে উঠে চিরোকে ভাসিয়ে দিল।

সে মনে মনে অরোকে তার মৃদু হাসি, শান্ত ভদ্র ব্যবহার, ভীরুর মত ভাবভঙ্গিসহ কল্পনা করল। অরো ভাবে চিত্রা তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে, কিন্তু কখনোই চিত্রা বুঝতে দেবে না যে তাকে সে ভালবাসে। দিনেনের জান্তব পৌরুষের প্রতি আকর্ষিত নন্দার কথা ভাবল। সে বিশ্বাস করে তার স্বামী তার প্রতি বিশ্বস্ত, তার উপর নির্ভরশীল, তাই সে নিজের সুখ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। বেচারা এত ভাল।

চিরো ভাবল দিনেনের কথাও। শক্ত সমর্থ, জোরালো চরিত্রের মানুষ। ভদ্র মানুষ। নন্দা যা সিদ্ধান্ত নেবে তাই

মেনে নেবে। কষ্ট পেতে হয় যদি স্বীকার করবে। বদান্য, হৃদয়বান দিনেন।

একটু একটু করে আবেগ ফিরে চলে গেল চিরোর মন থেকে। বদলে ধীরস্থির হয়ে এল তার মন। সিগারেট ধরাল। কখনো যা কল্পনা করেনি, সেই কাজই করবে ঠিক করেছে। নিজের আকাঙ্ক্ষা বাসনা বিসর্জন দেবে ওদের সুখী করতে।

রান্নাঘরের দরজার কাছে এসে সে দাঁড়াল। বুকের মধ্যে দ্রুত দপদপানি চলছে। কিন্তু সে বদ্ধপরিকর। বুড়ো উঠোনে একইভাবে শুয়ে। চিরো কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল দরজায় দাঁড়িয়ে। নন্দা খুন্তি হাতে কড়াইয়ে কি একটা নাড়ছে।

'নন্দা।'

মুখ থেকে জোর করে শব্দটা বার করতে হল চিরোকে। নন্দা মুখ ফিরিয়ে একবার তাকাল, সাড়া দিল না।

'নন্দা।' চিরো আবার ডাকল।

নন্দা খুন্তি নাড়া বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল। কয়েকটা চুল চোখের উপর ঝুলে রয়েছে। ওকে নির্জীব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

'বলো।'

চিরো এক ধরনের অদ্ভুত আনন্দবোধ করল ঠিক এই মুহূর্তে। অবিমিশ্র খাঁটি আনন্দ, যা একমাত্র দাতার পক্ষেই জানা সম্ভব।

সে কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করল নন্দার অসুখী মুখের দিকে তাকিয়ে। ওর জন্য কি উন্মত্ত সুখ নিয়ে যে সে অপেক্ষা করছে নন্দা তা জানে না। চিরো নিজেকে এখন পবিত্র শুদ্ধ বোধ করছে না, শুধুই আনন্দিত।

পিছনে পায়ের শব্দ, তারপর কণ্ঠস্বর শুনল চিরো। চটি থেকে ধুলো ঝাড়ছে অরো। পলকের জন্য চিরো একসঙ্গে দেখল চিত্রা আর অরোকে। ওর চওড়া নিরক্ত ঠোঁট দুটো চিত্রার ঠোঁটে, ওর গভীর সুরেলা কণ্ঠস্বর কূজন করছে চিত্রার কানে। সে কল্পনা করল অরো বিয়ে করেছে চিত্রাকে- আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না চিরো। 'একটু ঘুরে আসি', বলে সে বেরিয়ে গেল। যদি দু'মিনিট দেরী করেও অরো আসতো তাহলে ওলট-পালট হয়ে যেত ওদের জীবন।

বাইরে ঘুরতে না গিয়ে চিরো বাগানে এসে বসেছিল, কাঁঠাল গাছের নীচে সিমেন্টের বেদীতে। ঈর্ষার জ্বালা, তখনো চেতনায়। যেভাবেই হোক, ন্যায় বা অন্যায় যে পদ্ধতিতে হোক, যা সে চায় তা দখল করার জন্য নির্বোধ সহৃদয় দুর্বলতাকে হটিয়ে দিয়ে লড়ার সংকল্প আবার তার মধ্যে ফিরে এসেছে।

অরো বাংলো থেকে বেরিয়ে তার কাছে এসে দাঁড়াল।

'ঘুরতে গেলি না?'

'ভাল লাগল না।'

'বেশ গরম পড়ে গেছে।'

চিরো মুখ তুলে দেখল, অরোর মুখে কতকগুলো রেখা, যা আগে ছিল না। চোখের কোলে ছায়া পড়েছে।

'হঠাৎ বার্নপুরে?'

'বার্নপুর ঠিক নয়, আসানসোলে। মক্কেল পাকড়াতে গেছলাম। গিয়ে শুনি এক সপ্তাহের জন্য দিল্লি গেছে। ফিল্মে নামতে চায়, অঢেল ঠিকেদারীর টাকা।'

মিথ্যে কথা। চিরো মনে মনে হাসল। চিত্রার সঙ্গে ট্রেনে গা ঘেঁষাঘেঁষি করার লোভ সামলাতে পারেনি।

‘ডকুমেন্টারি করতে কেউ টাকা ঢালবে না।’

‘ভাবছি ফীচার ফিল্মেই হাত দেব। বাচ্চাদের জন্য ছবি করব।’ থেমে একটু হেসে অরো যোগ করল, ‘অ্যাডভয়েসটা ছাড়বো। চিত্রার সঙ্গে কথা হয়েছে, যতদিন না দাঁড়াতে পারবো ও স্টেজের কাজ চালিয়ে যাবে। ও রাজি আছে।’

‘চিত্রা অন্য ধরনের।’ কথাটা বলেই চিরো ভাবল, যদি চিত্রাকে পাই এবং পাবই, তাহলে ও আর জীবনে কখনো স্টেজে পা দেবে না।

‘তবে মনে হয় না বেশিদিন ওকে অভিনয় করার কাজ করতে হবে।’ অরো বলল।

‘করতে হবে না?’

‘ও এমনই মেয়ে, ওর জন্য পৃথিবী জয় করতে ইচ্ছে করে।’

‘এমন ধরনের?’

চিরো মজা পাচ্ছে। অরোর মতন বুদ্ধিমানও মনের ভাব প্রকাশের জন্য বস্তাপচা বহু ব্যবহৃত কথা ছাড়া আর কিছু খুঁজে পেল না।

‘সাকসেসফুল না হবার কোন কারণ নেই। ঠিক করেছি কমার্শিয়াল হবো। বম্বে ফিল্মকে তাক লাগিয়ে দেব।’

‘দাঁড়িয়ে আছিস কেন, বোস।’

চিরো একটু সরে বসল অরোকে জায়গা দিয়ে। তারপর বলল, ‘তোর নাম না হওয়ার কোন কারণই নেই। নিশ্চয় হবে। প্রথম ছবিতেই হবে।’

ব্যর্থ হওয়াদের সাধারণত যে ধরনের আশ্বাস দেওয়া হয়, অনেকটা সেভাবেই চিরো বলল, ‘যে লোকের সফল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তার সঙ্গে উপায় বা সুযোগ নিয়ে কথা বলা যায়, ব্যর্থদের সঙ্গে তা করা যায় না।’ চিরো জানে, অরোর দ্বারা ব্যবসায়িক ছবি সম্ভব নয়। ও অত্যন্ত আবেগপ্রবণ, দ্বিধাপীড়িত এবং ধড়িবাজিতে অপটু।

‘তুই ঠিক বলছিস, প্রথম ছবিই হিট করবে?’ অরোর চোখ উত্তেজনায় ঝলসে উঠল। রেখাগুলো বা ছায়া মুখ থেকে মুছে গেছে মনে হল চিরোর।

‘আমি ঠিকই বলছি, অনেস্টলি।’

‘হলে, চিত্রার জন্যই হবে। কিভাবে যে ও আমায় ইনফ্লুয়েন্স করে।’

আর ঈর্ষাবোধ করছে না চিরো। তার পাশে বসা অরোর জীর্ণ দেহ, বাতাসে ব্রহ্মতালুতে খাড়া চুলগুলির কম্পন দেখতে দেখতে সে ভুলে গেল বিরাগ।

‘আমাদের বিয়ের পর তুই আসা বন্ধ করবি না তো?’

চিরো বেশ জোরেই হেসে উঠল, ‘কি যে বলিস। ভাল কথা, নন্দাকে জানাচ্ছিস কবে।’

‘জানাবো’ অন্যমনস্কের মতো অরো বলল, ‘সময় হলেই জানাবো।’

বুড়ো বেরিয়ে এসেছে। অরো শিস দিয়ে হাত নাড়তেই সে পরিচয় জ্ঞাপনের জন্য ল্যাজ দোলাতে দোলাতে এগিয়ে এল। বুড়োর কানের পিছন ও গলা চুলকিয়ে দিতে লাগল অরো।

চিরো একটা কথা বলি, ‘আমার এই সময়ে তোকে পাশে পেয়ে যা ভাল লাগছে!’

‘কি আর আমি করেছি।’ চিরো অস্বস্তিভরে বলল, ‘আমাকে ছাড়াই চলে যাবে।’

অরো মাথা নাড়ল।

‘এই সময়টায় কথা বলার জন্য কাউকে চাই। তোকে পেয়ে বেঁচে গেছি, নয়তো-’

অরো কথা বন্ধ করে আবার মাথা নাড়ল এবং বুড়োর পিঠে, পাঁজরে চাপড় দিতে থাকল। চিরোর মনে হল তার হৃৎপিন্ডটা কেউ মুঠোয় চেপে ধরেছে। সে বলল, ‘চল এবার ভিতরে যাই।’

দুপুরে সকলের খাওয়া শেষ হবার পর বুড়ো মরে গেল।

ব্যাপারটা এইভাবে ঘটে।

ভিতরের দালানে অরো, চিরো এবং নন্দা টেবিলে বসে যতক্ষণ ধরে খাচ্ছিল, বুড়ো ততক্ষণ উঠোনে উঁচু হয়ে বসেছিল। তিনটি কুকুর, সম্ভবত বুড়োরই অধস্তন চতুর্থ কি পঞ্চম পুরুষ, বয়সে তরুণ, উঠোনেই দরজা ঘেঁষে অপেক্ষা করছিল উচ্ছিষ্টের আশায়। ভিতরে আসতে পারেনি অরোর ভয়ে।

খাওয়ার সময় অরো কই মাছের মুড়ো এবং কাঁটা প্লেটে রাখছিল বুড়োর জন্য। চিরো এবং নন্দাকেও রাখতে বলে।

খাওয়া শেষ হতে অরো বলল, তোমরা যাও, আমি বুড়োটাকে খাইয়ে যাব। নয়তো ওগুলো সব কেড়ে খেয়ে নেবে। ‘আর একটু ভাত লাগবে, রান্নাঘরে আছে?’

নন্দা বলল, ‘দেখতে হবে। খুকি সবটাই নিয়ে গেছে কিনা জানি না।’

নন্দা রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিল, অরো বাধা দিয়ে বলল, ‘থাক, আমিই দেখছি।’

ব্যস্ত হয়ে কাঁটা ভরা প্লেট হাতে অরো রান্নাঘরে ঢুকল। নন্দা এবং চিরো বাথরুমে হাত ধুয়ে দালানে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। মিনিট চারেক পর অরো রান্নাঘর থেকে বেরোল।

নন্দা জিজ্ঞাসা করল, ‘এত দেরী হল যে? পেয়েছ?’

‘হ্যা, কাঁটার সঙ্গে মেখে দিতে দেরী হল।’

অরো প্লেটটা উঠোনে রাখতেই বুড়ো এগিয়ে এসে খেতে শুরু করে। ওর পিঠে কয়েক সেকেন্ডের জন্য হাত রাখলো অরো। সিগারেট ধরিয়ে চিরো মশলার কৌটা থেকে সুপুরি বাছছে। কৌটাটা ধরে আছে নন্দা।

খাওয়া শেষ করে বুড়ো দরজার দিকে আস্তে আস্তে এগোল। কিন্তু দরজা পর্যন্ত ও পৌঁছল না। গজ তিনেক গিয়েই ধীরে ধীরে উঠোনে শুয়ে কাত হয়ে গড়িয়ে পড়ল। একবার যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলল শ্রান্তের মত। তারপর অনড় হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে অরো এগিয়ে গেল কুকুরটার দিকে। কয়েক সেকেন্ড পর অদ্ভুত স্বরে বলল, ‘একদম মরে গেছে।’ সঙ্গে সঙ্গে, ছটফটও করেনি। এভাবে মরা অনেক ভাল; কাতরানি নেই, খাবি খাওয়া নেই। ঠিক যেন ঘুমিয়ে পড়ল।’

নন্দা এবং চিরো এগিয়ে এসে ঝুঁকে বুড়োকে দেখল। অন্য কুকুরগুলো পালিয়ে গেছে। আঙ্গুল কামড়াচ্ছে নন্দা, মুখ থমথমে। বলল, ‘বেচারা বুড়ো, ও না থাকলে বাড়িটা অন্যরকম লাগবে। কি যেন একটা নেই মনে হবে।’

অরো একদৃষ্টে নন্দার মুখের দিকে তাকিয়ে। তারপর বলল, ‘ওকে ভুগতে হল না। কোন রকম জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যেতে হল না। এটাই হচ্ছে বড় কথা। মরতে তো এক সময় হবেই, আমাদেরও হবে। কয়েকদিন বা কয়েক মাস বা কয়েক বছর আগে আর পরে কখন মরছো সেটা তো কথা নয়, কিভাবে মরছো সেটাই আসল কথা।’

চিরোর মনে পড়ল, এইরকম কথাই যেন অরো বলেছিল স্কুলে পড়ার সময়।

যোগেনের ব্যবস্থাপনায় বাগানের এককোণে বুড়োকে কবর দেওয়া হয়।

বিকেলে চিরো জানাল কলকাতায় তার জরুরী কাজ আছে। নন্দা এবং অরোকে তাদের নিজস্ব ভাবনার মধ্যে রেখে চিরো রওনা হয়ে যায়।

বারুইপুর থেকে দ্রুত গাড়ি চালিয়ে সে পৌঁছল দমদমে শ্রীপুর কলোনিতে। তার কেন যেন মনে হচ্ছে চিত্রা ফিরেছে, আজই দুপুরে।

তার অনুমান মিথ্যা হল না।

সন্ধ্যা নেমেছে কিন্তু অন্ধকার গাঢ় হয়নি, এমন সময় সে চিত্রাদের বাড়ির সামনে হর্ণ বাজালো। পিছনের বাড়ি, পাশের বাড়ি থেকে মুখ উঁকি দিল।

চিত্রাদের একতলার দরজা খুলে বেরিয়ে এল একটি মেয়ে। একই সঙ্গে দোতলার জানালায় দাঁড়াল চিত্রা। অন্ধকারেই চিরো হাত নাড়ল। হর্ণের শব্দ ও গাড়ি দেখেই সে বুঝেছে কে এসেছে।

দু'মিনিটের মধ্যেই চিত্রা বেরিয়ে এল।

'আপনি আবার আশ্চর্য করলেন।'

'ফিরলেন কখন? কথা ছিল আপনার অভিনয় থাকলে জানাবেন, কথা রাখেননি।'

ঝড়ের বেগে কথাগুলো চিরো বলল।

'সে তো বার্নপুরে।'

'তাতে কি হয়েছে, যেতাম। পৃথিবীর শেষ প্রান্তেও যেতে রাজি আপনার অভিনয় দেখতে, এতো মাত্র বার্নপুর।'

কথাটা বলেই চিরো ভাবল, সংলাপটা খুবই কাঁচা হল, কিন্তু আর কিছু এখন মুখে আসছে না। চিত্রা বুদ্ধিমতী, নিশ্চয় বুঝে নেবে এসব কথার কি অর্থ, বুঝুক! অন্ধকারে ওর মুখভাব বোঝা যাচ্ছে না।

চিত্রার হাসি শুনে চিরো আশ্বস্ত হল।

'এই জেট আর রকেটের যুগে পৃথিবীর শেষ প্রান্তে যাওয়া অনেক সোজা, বার্নপুরে ট্রেনে যাওয়া-আসার থেকে।'

'কষ্ট করার সৌভাগ্য থেকেও আমাকে বঞ্চিত করেছেন, ডাবল ফাইন হওয়া উচিত।'

'কি রকম।'

'চলুন বেরোই।'

'এখন! বিশ্বাস করুন ক্লান্তিতে শরীর ভেঙ্গে পড়ছে। শুয়ে ছিলাম।'

'বিশ্বাস করছি। কিন্তু আপনাকে হার্ডল রেস করতে বা এয়ার পলুশানের উপর বক্তৃতা শুনতে যেতে বলছি না। ময়দানে কিসের একটা মেলা বসেছে চলুন দেখে আসি।'

'কিন্তু ফিরতে যে রাত হয়ে যাবে।'

'হোক। দু'মিনিট সময় দিলাম।'

'দুমিনিট!'

'বেশি দিলাম বোধহয়। সুন্দরী মেয়েদের সাজগোছ না করলেও চলে। যে-কোন শাড়ি, চটিতেই মানিয়ে যায়, শুধু বাড়িতে বলে আসার জন্য সময় দিলাম এক মিনিট।'

'আপনি ভিতরে এসে বসুন ততক্ষণ।'

চিত্রার গলায় হুকুমের আমেজ, কিন্তু হালকা চালে। চিরো ভাবল মান্য করাই উচিত।

দরজার পাশেই যে ঘরটায় সে বসল, চিরোর মনে হল এটায় চিত্রার ভাই থাকে। তাকে এলোমেলো পড়ার বই, দেয়ালে হ্যাঙ্গারে ঝুলছে প্যান্ট, তক্তপোসে গোটানো বিছানার তলা থেকে বেরিয়ে রয়েছে ক্রিকেট ব্যাটের হাতল।

একটা মেয়ে চা নিয়ে এল। সুন্দর নক্সা করা কাপ ও পিরীচ। চিরো আন্দাজ করল নিশ্চয় চিত্রার বোন, মুখের মিল রয়েছে।

'দিদিকে একটু তাড়া দেবে? তোমার নাম কি?'

'গীতা। বলছি দিদিকে।'

মেয়েটিকে মিশুকে মনে হল না চিরোর।

দশ মিনিট পর চিত্রা নেমে এল। ওর হালকা প্রসাধনে যত্নের ছাপ দেখতে পেল চিরো। তার সঙ্গে বেরোনকে গুরুত্ব দিয়েছে। কিংবা হতে পারে, পেশাদার অভিনেত্রী বাইরে চটক বজায় রাখতে চায়। প্রথম দেখা হওয়া দিনটির হাল্কা সবুজ রেশম শাড়িটি পরেছে এমনভাবে, যা শরীরের রেখাগুলোকে স্পষ্ট করে। চিরো আবার কামনা করল চিত্রাকে।

তারা ময়দানের মেলায় এল। যা খুশি তাই খেল। কিছুক্ষণ ম্যাজিক দেখল, কিছুক্ষণ বাউলের গান শুনল। কবিদের আসরে খানিকটা সময় দিল, বেলুন ফাটালো ছররা ছুড়ে, জিমন্যাসটিক দেখল এবং জায়ান্টি হুইলে চড়ে বনবন পাক দিয়ে উপর-নীচ করার সময় চিরোর বাহু আঁকড়ে কাঁধে মুখ গুজে চিত্রা ফিসফিসিয়ে বলল, মাথা ঘুরছে। তখন চিরো নিজের গাল ঠেকাল চিত্রার মাথা, বাহু-ধরা চিত্রার আঙ্গুলগুলো চেপে ধরল সজোরে এবং মনে মনে বলল, যেভাবেই হোক তোমাকে দখল করতেই হবে।

নাগরদোলা থেকে নামতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে চিত্রার চটির স্ক্যাপ ছিড়ল। সঙ্গে সঙ্গে কুড়িয়ে নিয়ে বগলে রাখল চিরো বইয়ের মত। চিত্রার কোন আপত্তি শুনল না।

ঘূর্ণিঝড়ের মত চিরো ঘন্টা দুয়েক চিত্রাকে এলোমেলো করে রাখল। বারুইপুর থেকে আসার পথেই সে ঠিক করে রাখে, চিত্রার নিঃসঙ্গতা এবং তার তাড়াহুড়োমি, এই দুটির উপর সে নির্ভর করবে। অরো কিছু ভাববে কিনা, এই চিন্তা চিত্রার মনে আসতেই দেবে না। সেদিক থেকে চিরো সফল হয়েছে। তার মনে হচ্ছে, বহুকাল চিত্রা এমন উচ্ছল আমুদে সময় কাটায়নি। গোমড়া, ভদ্র, সিরিয়াস অরো এমনভাবে চিত্রার সময় কিছুতেই কাটিয়ে দিতে পারবে না।

সারাক্ষণ শুধু হাসি আর হাসি, শুধু ব্যতিক্রম বাড়ি ফেরার সময় পথের শেষ দিকটায়।

মানিকতলা মেন রোড থেকে ভিআইপি রোডে পড়ার পর চিরো জিজ্ঞাসা করে, 'আবার কবে আমরা বেরোচ্ছি?'

চিত্রা নিরুত্তর রইল।

'পঁচিশে বৈশাখে শান্তিনিকেতনে যাবেন? আমি এখনো পর্যন্ত দেখিনি।'

চিত্রা এবারও জবাব না দেয়ায় চিরো আন্দাজ করল, এখন ও কি ভাবছে। এবার সে বলল, 'আমার মনে হয় না। অরো কিছু মনে করবে।'

'না, না, এসব কিছু অরো মনে করবে না। প্রকৃতিটা উদার ওর। তবে একটু আধটু হিংসা হয়তো হবে। এরকমভাবে সন্ধ্যাটা কাটানো ওর দ্বারা সম্ভব নয়।'

অ্যাকসিলারেটর চেপে একটি বাসকে অতিক্রম করে গতিটা চল্লিশ কিলোমিটারে রেখে চিরো বলল, 'হিংসে করার অধিকার ওর আছে কিনা তাতে আমার সন্দেহ আছে।'

'অর্থাৎ?'

'আমি কি বলতে চাই, আপনি সেটা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন।'

'হ্যাঁ', নরম স্বরে চিত্রা বলল। তারপর আবার বলল, 'হ্যাঁ।'

চিত্রার হাত চিরোর পাশেই আলতোভাবে সীটের উপর। ওর চটি জোড়া পিছনের সীটে। চিরো বাঁ হাতটা রাখল ওর হাতের উপর সন্তর্পণে। 'অরো দারুণ রকমের রোমান্টিক। সব সময় ও খুঁজে বেড়ায় আদত ভালবাসা।'

মৃদু চাপ চিত্রার হাতে দিয়েই চিরো নিজের হাত স্টিয়ারিংয়ে তুলে নিল।

'সব সময়ই খোঁজে? তার মানে আপনি বলছেন, ওর প্রথম খোঁজার ফল আমি নই?'

চিরো মাথা নাড়ল।

'জানি না। হয়তো, হয়তো নয়। যদি জানতাম তাহলেও আপনাকে বলতাম না। আমার কোন মাথাব্যথা নেই এ নিয়ে।

চিত্রা চুপ রইল। সীট থেকে হাতটা সরায়নি। থাকুক, চিরো মনে মনে বলল, এবার টেক্কাটা ফেলা যাক।

'তাছাড়া', চিরো অন্যমনস্ক স্বরে বলল, 'যাই ও করুক না, নন্দার শরীরের কথাটা ওর বিবেচনা করা উচিত।'

চিত্রা চট করে মুখ ফেরাল। চিরো সামনের রাস্তার প্রতি মনোযোগী রইল।

'শরীর! খারাপ নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'কি হয়েছে নন্দার? কই এ সম্পর্কে অরো আমায় কিছু তো বলেনি?'

বেচারা চিত্রা। চিরো অনুমান করতে পারছে সন্দেহ আর ভয় কিভাবে ওর গলাটা টিপে ধরছে হিমশীতল আঙুলগুলো দিয়ে। কষ্টবোধ করল চিরো। তার ইচ্ছে করছে, গাড়িটা থামিয়ে চিত্রাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, কিছু হয়নি নন্দার, শরীর ঠিকই আছে। শুধু একবার তার বুকের ধড়ফড়ানি হয়েছিল অত্যধিক মাথা ধরার ওষুধ খেয়ে।

'আমার মনে হয় না।' চিরো সাবধানে বলল, 'নন্দার হার্ট খুব জোরালো, অবশ্য সিরিয়াস কিছু নয়।'

চিরো শেষ বাক্যটি একটু ব্যস্ত হয়েই জুড়ে দিল। কোন বিষয়ে যদি সত্যের আভাস ছোঁয়াতে হয় তাহলে এক-পা পিছিয়ে এসে অস্বীকার করাই ভাল। তাতে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা যায়।

'আচ্ছা!' ধীরে চিত্রা বলল। 'আমি তো জানতাম না, এটা আমি জানতামই না। আমাকে কখনো বলেনি তো।'

'বলেনি অরো? হয়তো দরকার মনে করেনি। খুব কিছু একটা সিরিয়াস তো নয়।'

চিত্রা কিছু বলল না দেখে চিরো বলল, 'যাই হোক, এটা কিন্তু আপনি অরোকে বলবেন না। ভাববে, আমি বোধহয় নাক গলাচ্ছি।'

'বলব না কেন, নিশ্চয় বলব। অনেক কিছুই নির্ভর করে এটার ওপর।'

'অরোর সঙ্গে আমি ঝগড়া করতে পারব না, চিত্রা। ছোটবেলা থেকে আমার বন্ধু। আপনাকে বলাটা মনে হচ্ছে, উচিত হয়নি। ভেবেছিলাম, আপনি এটা জানেন।'

কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে চিত্রা বলল, 'বেশ, বলবো না অরোকে। নন্দার হার্ট ভাল নয়, এটা জানিয়ে ভালই করলেন।'

বাড়ির সামনে গাড়ি থামিয়ে চিরো নামল। ঘুরে এসে চিত্রার জন্য দরজা খুলল। নেমে চিত্রা বলল, 'চটিজোড়া দিন।'

'না।'

‘সে কি।’

‘দেওয়া যায় না। কারণ, ওরা আপনার পায়ে ধরার সুযোগ পায়। আমাকে হিংসেয় ফেলার জন্য ওদের শাস্তি দিয়ে ফেরৎ পাঠাব।’ গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল চিরো। চিত্রা শুধুই দাঁড়িয়ে রয়েছে। গুনগুন করতে করতে চিরো ফিরল। একবার তার মনে পড়ল অরোর কথা। বেচারা! বাচ্চার হাত থেকে মোয়া তুলে নেওয়াও এর থেকে শক্ত ব্যাপার।

ঘুমন্ত নন্দার মুখের দিকে তাকিয়ে অরো ভাবল, একদিন না একদিন ওকে তো মরতেই হবে। বুড়ী হয়ে অক্ষম জরাগ্রস্ত হওয়া পর্যন্ত নিজেকে টেনে নিয়ে শেষ পর্যন্ত কি লাভ, কি সুখ ও পাবে! এইভাবে যদি ঘুমিয়ে পড়ে, কষ্ট-যন্ত্রণা না পেয়ে যদি ঘুমিয়ে পড়ে, সেটাই কি ভাল নয়! এর বদলে, পরিত্যক্তার মানসিক যন্ত্রণা, নিঃসঙ্গতা, চারধার থেকে করুণার পীড়ন ভোগ করার মতন বিশ্রী ব্যাপার আর হয় না। তা হতে দেওয়া যায় না।

প্রতিদিন সকালে নন্দার আগে ঘুম ভাঙ্গে। কি শীতে কি গ্রীষ্মে। গ্যাস জ্বেলে চা করে। খেয়ে, সে খবরের কাগজ নিয়ে বসে। অরো তখনো ঘুমিয়ে থাকে। দ্বিতীয়বার চা করে অরোকে জাগায়।

আজ সে নন্দার আগেই জেগেছে। ওর ঘুম যাতে ভেঙ্গে না যায়, তাই নড়াচড়া না করে অনেকক্ষণ চিৎ হয়ে শুয়ে থেকে ধীরে ধীরে মাথাটি ঘুরিয়ে সে তাকায় নন্দার মুখের দিকে এবং ভাবতে থাকে, কি করবে, বিশেষত কিভাবে সে করবে।

নন্দা ঘুমিয়ে আছে শান্ত মুখে। নিরাসক্ত মনে অরো ভাবল, এভাবে হয়তো ওর দিকে এই তার শেষ দৃষ্টিপাত। চেষ্টা করল মনের মধ্যে কোমল আবেগের শিখা জ্বালাতে। কিছুই জ্বলল না।

সন্তর্পণে বিছানা থেকে উঠে সে বসার ঘরে এল। তিনদিন ছুটি নিয়ে মতি বসিরহাটে তার দেশে গেছে। কাগজের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল সিগারেট ধরিয়ে।

কিছুক্ষণ পর নন্দা বসার ঘরে এল। ঘুমে ফোলা মুখখানি তাজা এবং কচি দেখাচ্ছে। অরো নিরাবেগ মন নিয়ে লক্ষ্য করল, নন্দা বেশ সুন্দরীই। তারপর খুশি হল এই ভেবে যে, আবেগ চুঁইয়ে হৃদয়ে মাখামাখি হবার পথগুলো সে বেশ ভালভাবেই বন্ধ করতে পেরেছে।

‘কি ব্যাপার আজ যে এত ভোরে!’

‘এমনিই, হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। ভাবলাম, কলকাতার সকাল অনেকদিনই তো দেখিনি, আজ একটু দেখব।’

‘দেখলে?’

‘এই ঘর থেকে যতটা। তোমাকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে।’

হেসে নন্দা বেরিয়ে যেতে গিয়েও থেমে বলল, ‘প্রশংসাই বটে।’

‘বিজ্ঞাপনের মত। কাগজে যেমন দ্যাখো এক কাপ মিলকোজেন পান করুন, আট ঘণ্টা ঘুমোন এবং আমার মত রূপসী হোন।’ নন্দা চা করে আনল।

চা খেতে খেতে অরো হিজিবিজি গল্প করল। সে জানে নন্দা কথা বলতে ভালবাসে এবং আজকের সকালটায় যাতে ও খুশি থাকে সেদিকে বিশেষ নজর সে দিয়েছে।

কাগজ আসতেই দু’জনে ভাগ করে নিল পাতাগুলো। অরোর অভ্যাস বিছানায় শুয়ে কাগজ পড়া। শোবার ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে, সিগারেট খেতে খেতে পড়তে লাগল। সিগারেটটা ফুরিয়ে আসতেই বিছানার পাশে টেবিলে রাখা অ্যাশ-ট্রেতে সেটা নেভাতে গিয়ে তার চোখে পড়ল আধগ্লাস জল, একটি চামচ ও হজমী ওষুধ সিকোজাইমের কৌটাটি।

উঠে বসল অরো। কৌটার ঢাকনা খুলে দেখল প্রায় অর্ধেক খালি। ধীরে ধীরে এবং নিঃসাড়ে সে তার চিন্তাটাকে

নিয়ে একটা মতলবের চারপাশে ঘুরপাক খেতে শুরু করল। একটা বেড়ালকে হঠাৎ কিছু খাবার ধরে দিলে প্রথমে সে যেভাবে সাবধানে শোঁকে, অরো সেইভাবে তার মতলবকে গ্রহণযোগ্য কিনা ভাবতে লাগল।

সেই দুটো জিনিস মনে করতে চেষ্টা করল। প্রতিদিন নন্দা কতটা করে খায় এবং ওর হজমের গোলমাল ঘটলে কতবার খায়। তার মনে হয়েছে প্রায় চার চামচ এখনো কৌটায় রয়েছে। যতদূর মনে পড়ছে, নন্দা প্রতিবার দু'চামচ জলে গুলে খায়।

সেই লেখাটায় বলা আছে জিনিসটা স্বাদহীন। সিকোজাইমও তাই। বুড়োর ব্যাপারটা সে ভাবল। ঝামেলা না করেই কুকুরটা খেয়ে নেয়। কিন্তু ভাতগুলো গপগপ করে গিলে নিয়েছিল। স্বাদ আছে কি নেই, সেটা এর থেকে বোঝা সম্ভব নয়।

ধরা যাক, পুরিয়ার গুঁড়োটা যতটা দরকার তার দ্বিগুণ সে দিল কৌটার মধ্যে। নন্দা কি সেটা ধরতে পারবে? ওষুধটা ও ঢক করে গিলে খেয়ে নেয়। সুতরাং স্বাদের তারতম্য বুঝতে পারলেও দেরী হয়ে যাবে। যদি বুঝতে পারে আর তারপরই জ্ঞান হারাতে শুরু করে তাহলে ও ভয় পাবে। নন্দা তাকে সন্দেহ করবে না কিন্তু মারা যাবার আগের মুহূর্তে ওষুধ তৈরীতে কোন ত্রুটি ঘটেছে ভেবে ভয় পাবে। এরকম ত্রুটির কথা তো কাগজে প্রায়ই থাকে।

অরোর মনে এল, সামান্য বুক ধড়ফড়ানি হতেই নন্দা কেমন ভয় পেয়ে গেছল। 'কি রকম যেন লাগছে, অরো, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। পারছি না, পারছি না, বুকের মধ্যে কেমন যেন করছে।' বলতে বলতে জানলার কাছে ছুটে গিয়ে নন্দা হা করে বাতাস গিলতে থাকে। তারপর দুচোখে প্রচন্ড ভয় নিয়ে সে ঘুরে দাঁড়িয়ে কাতরে ওঠে 'অরো, অরো।' তারপর আবার 'অরো, অরো'। ডাক্তার ডাকতে যাবার আগেই বাথরুমে গিয়ে নন্দা মাথায় জল থাবড়ে ঘরে পায়চারী শুরু করেছিল চোখে সেই ভয় নিয়ে।

গুরুতর কিছু হয়নি। কিন্তু তখন অরো মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে ভেবেছিল, "এভাবে নয়, হে ভগবান, এভাবে ওকে মেরে আমাকে মুক্তি দিও না।"

কিন্তু তারপর থেকে আজ পর্যন্ত ধীরে ধীরে সে বদলে গেছে। এখন সে নন্দার মৃত্যু চায় কিন্তু যন্ত্রণা বা ভয়ের মধ্য দিয়ে নয়। সেজন্য অপেক্ষা করতেও সে রাজি, এক সপ্তাহ, একমাস, এক বছরও।

- কাগজ হাতে সে বসার ঘরে এল। নন্দা মুখ তুলে দেখল একবার।

"আবার কি হজমের গোলমান হচ্ছে? ঘরে ওষুধটা দেখলাম?"

"তেমন কিছু নয়। ইদানিং একটু-আধটু খাওয়া দরকার হচ্ছে।"

"দিনে কতবার খাও?"

"রাতে শোবার আগে। কিনতে হবে একটা, এটা ফুরিয়ে এসেছে।"

"আমি কিনে আনব'খন।"

"আজ আর কালকের মত আছে।"

"আজই কিনে আনব।"

"এত তাড়াতাড়ির কিছু নেই।"

যা জানতে চেয়েছিল অরো তা জেনে গেল। রাতে শোবার আগে একবার খায়, সম্ভবত দু'চামচই। সেলোফেন মোড়কটা স্ক্রিপ্টের খাতাটার মধ্যেই আছে। নন্দা ওতে হাত দেয় না। দেবার কারণও নেই।

শান্ত মনে অরো দাড়ি কামাল, স্নান করল। সময় নিয়ে ভাবতে ভাবতে সে কাজগুলো সারল। মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মিটিয়ে একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারায় সে হালকা বোধ করছে।

আজই সে সিকোজাইল কিনবে। ফ্ল্যাটে ফিরে এসে যখন নন্দাকে মৃত দেখবে, তখন বিষ মেশান কৌটাটার

জায়গায় নতুনটা রেখে দেবে। দাঁত মাজতে মাজতে থেমে গিয়ে অরো অবাক হয়ে ভাবে, আশ্চর্য 'মৃত' শব্দটার সঙ্গে সঙ্গে এমন কুঁকড়ে গেল কেন মনটা। "নন্দা মৃত।" কল্পনা করা শক্ত এমন গোছানো, জোরালো মেয়েটি মৃত। জীবনের সবকিছু স্তব্ধ। অসম্ভব মনে হয়।

ঘড়ি দেখে হিসেব করল অরো। রাতে নন্দার শুতে যাবার এখনো পনেরো ঘন্টা বাকি। রেডিও শেষ হলে, ঘড়ি মিলিয়ে এগারোটায় শোয়।

নন্দা পনেরো ঘন্টা পর মারা যাবে, তাতে অরোর মনে এখন আর কোন সন্দেহ নেই। এখন আর তার পক্ষে থামা সম্ভব নয়। ঘটনাগুলো সার দিয়ে চলেছে, তার সঙ্গে সেও জড়িয়ে পড়েছে অপ্রতিরোধ্যভাবে। সে জানে মনের দিক থেকে তার আর রেহাই নেবার ক্ষমতা নেই। যন্ত্রটাকে সে চালিয়ে দিয়েছে। তার থেকেও ওটার ক্ষমতা বেশি। এখন আর সে থামাতে পারবে না।

মনে মনে অরো ছক ভাঁজতে লাগল।

নতুন কৌটা থেকে এক চামচ মতন রেখে বাকিটা ফেলে দেবে। বেশিও নয়, কমও নয়। যদি তদন্ত হয়, তাহলে পুরো নতুন কৌটা নন্দার বিছানার পাশে দেখলে সন্দেহের উদ্রেক করবে। পুলিশ বা ডাক্তার বাবুর নজর অযথা নতুন কৌটার উপর পড় ক তা সে চায় না। ওরা হয়তো বাকি গুঁড়োটুকু অ্যানালিসিস করাতে চাইবে। তা করাক, কিছু এসে-যাবে না তাতে। কিন্তু পুরোনোটার খোঁজে সারা ফ্ল্যাট তন্নতন্ন করবে বা রাস্তায় আঁস্তাকুড়ে ঘাঁটবে এবং খুঁজে না পেয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, এটা সে চায় না।

বাথরুমের আয়নায় চুল আঁচড়াবার সময় সে ভাবল, এইসব ছোটখাট ব্যাপারগুলোই শেষ পর্যন্ত ধরিয়ে দেয়। সুতরাং এসব দিকে নজর রাখতে হবে।

যে কৌটাটায় বিষ থাকবে সেটাকে কি করে পাচার করবে? কয়েকটা সমস্যার উদয় হল অরোর মনে।

তার ফিরে আসার দৃশ্যটা সে কল্পনা করল। হাতে নতুন কৌটা সদ্য কেনা, এটা না বোঝবার জন্য লেবেলটা ঘষাঘষি করে ময়লা করে। বিছানার পাশে বিষ মেলানো পুরোনো কৌটাটা। নতুনটা রেখে সে পুরোনোটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ডাক্তারবাবুকে অবশ্যই ফোন করতে হবে। মিনিট পনেরো কি তারও কম সময়ে তিনি এসে যাবেন।

বাথরুমে চৌবাচ্চার পাড়ে বসে অরো স্বচ্ছভাবে চিন্তা করতে চেষ্টা করল। সময়ের ব্যাপারটা নিয়ে খুব সাবধান হতে হবে। শুধু সময়ের মাপজোকই নয়, কাকতালীয়ের মত একই সঙ্গে কিছু ঝামেলা, অনেক না দেখা, না ভাবা ঘটনা সম্পর্কেও সাবধান থাকতে হবে। এগুলোই প্ল্যানকে ওলট-পালট করিয়ে ফাঁসির দড়ি গলায় পরায়। কিন্তু যা আগে ভাবা সম্ভব নয়, তার সম্পর্কে কি করে সাবধান হওয়া যায়?

অধৈর্যভাবে অরো মাথা নাড়ল। অযথা কাল্পনিক বিপদ নিয়ে মাথা ঘামানো। বরং বাস্তব অসুবিধাগুলোর মধ্যেই তার থাকা উচিত। প্রচুর অসুবিধা আশপাশে রয়েছে।

আবার সে দৃশ্যটা কল্পনা করল। আবার সে নিজেকে দেখল কৌটা হাতে সেখানে দাঁড়িয়ে ঃ অভিযুক্ত করার মত পদার্থ হাতে। পাসের মিসেস চ্যাটার্জিদের ফ্ল্যাটে টেলিফোন, যেটাকে সে এখুনি ডায়াল করতে যাবে এবং যে কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারে ডাক্তার।

কিন্তু যে অরবিন্দকে সে দেখতে পাচ্ছে, সে অনড় হয়ে দাঁড়িয়েই রয়েছে। ব্যাপারটা অরোকে বিভ্রান্তিতে ফেলেছে। এইবার তার মনে ভয় ধরতে শুরু করল। তবু ভাল, মতি বাড়িতে নেই। পুলিশ সন্দেহ করবে, ওকে ইচ্ছে করেই ছুটি দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মতি নিজেই জানাবে, দেশ থেকে ভাইয়ের পাগলামি বাড়ার চিঠি পেয়ে সে পীড়াপীড়ি করে ছুটি আদায় করেছে নন্দার কাছ থেকে। হ্যাঁ, নন্দাই তাকে ছুটি দিয়েছে। মতির ভাইয়ের পাগল হওয়ার পিছনে অরোর কোন হাত নেই।

নিজেকে টেনে ধরে অরো বাস্তবে ফিরে এল। বারকয়েক মগে জল তুলে চৌবাচ্চায় ঢালল। প্রতিটি স্তর ধরে সে অসুবিধাগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল।

দুটো জায়গা আছে জিনিসটা লুকোবার। বাড়ির মধ্যে নয়তো বাইরে।

বাইরে কৌটাটা ফেলে দেওয়া কি বুদ্ধির কাজ হবে?

না হবে না।

কেন? ভুলটা কোথায় হবে?

আশপাশের বাড়ির কেউ হয়তো সেই সময় জানলায় দাঁড়িয়ে থাকবে। ফেলাটা দেখতে পাবে। পরে কিছু ঘটলে এই ফেলার ব্যাপারটা যুক্ত করবে।

তাহলে মিনিট পাঁচেক হেঁটে মৌলালির কাছাকাছি গিয়ে ডাস্টবিনে ফেললেই হয়, অনেক নিরাপদ সেটা।

না হবে না, এটা আরো বোকামির কাজ।

কেন বোকামি?

অরো, তুমি একটা বোকা! পাড়া-প্রতিবেশীরা জানবেই ঠিক কখন নন্দা মারা গেছে। যদি ওরা দেখে তুমি ওর মারা যাবার পর বাড়িতে এলে আর কয়েক মিনিট পরেই বেরিয়ে গেলে এবং আবার ফিরলে বেশ কিছুক্ষণ পর আর তখনো তুমি ডাক্তার ডাকোনি তাহলে কি বিপদকেই ডাকা হবে না? তোমার এই ছোট্ট ভ্রমণটি নিয়ে প্রশ্ন উঠলে মুশকিলে পড়বে না কি?

যদি প্রতিবেশীরা দেখেই ফেলে, তাহলে ওরা তো ভাবতে পারে ডাক্তারের বাড়িতে গেছলাম।

আকাশ কুসুম। ওরা ভাবতে পারে আবার নাও তো ভাবতে পারে। ধরো পথে প্রতিবেশীদের কেউ রকে বসে হাওয়া খাচ্ছে। সে দেখল একা বেরোলে এবং একাই ফিরলে লোকটা পরে দেখল ডাক্তারকে একা আসতে। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে লোকটার পরিচয়ও থাকতে পারে।

তাহলে এভাবে জিনিসটা ফাঁস হয়ে যেতে পারে।

বরং কৌটাটা বাড়িতেই থাক। অন্তত রাত্রির মত। পরদিন ফেলে দেওয়া যাবে কিন্তু এই রাত্রে নয়।

তাহলে বাড়িতেই রাখা সাব্যস্ত হল।

কোথায়?

কেন, যে-কোন জায়গায়। ডাক্তারের চোখে পড়বে না এমন জায়গায়। রান্নাঘরে অন্যান্য কৌটাগুলোর সঙ্গে, আলমারিতেও রাখা যায়। ডাক্তারবাবু ডেথ সার্টিফিকেটে সই করে চলে যাবেন। ব্যস, ওখানেই চুকে গেল ঃ করোনারি থ্রম্বসিস, কারণটা তাই লিখবেন।

সমস্যা চুকে গেছে ভেবে বাথরুম থেকে বেরোতে গিয়ে অরো থমকে দাঁড়াল।

করোনারি থ্রম্বসিসের মতই যে মনে হবে তার নিশ্চয়তা কি? ডাক্তারবাবু যদি তখুনি লিখতে রাজি না হন? বুড়ো খুঁতখুঁতে লোক, ধীরে-সুস্থে কাজ করেন। ডাক্তারীর প্রফেশনে ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়া একটা বিপজ্জনক কাজ। ভুল করে দিলে ডাক্তার বিপদে পড়বে। ডাক্তারের মাথার মধ্যে থ্রম্বসিসের ধারণাটা ঢুকিয়ে দেবার মত জ্ঞানগম্যি তার নেই। ডাক্তারবাবুকেই এক্ষেত্রে সিদ্ধান্তে আসতে হবে।

খুনের চিন্তাটা অবশ্য ওনার মাথায় আসবে না। এ নিয়ে চিন্তাই করবেন না।

কিন্তু আত্মহত্যা! যদি তাই সন্দেহ করেন?

বাথরুমের বন্ধ দরজায় কপাল চেপে ধরে অরো নিজেকে গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করল। সে কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে, ডাক্তারবাবু তাকে নিয়ে বসার ঘরে এলেন। কল্পনা করল তিনি বলছেন, "না, আমার কেমন মনে হচ্ছে....আপনার স্ত্রীর মনে কোনরকম কি কিছু ছিল....না, না, না, আপনার যতটুকু জানা বা বোঝা সম্ভব, নিশ্চয় নয়, কোনক্রমেই সম্ভব নয়....তবুও.....মডার্ন লাইফের নানারকম ঝঞ্ঝাট....নার্ভের উপর দারুণ চাপ

পড়তো, অরবিন্দ বাবু, অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপারও ঘটে....কাগজে এই সেদিনই একটা....বুঝতেই পারছেন আমাকে সাবধান হতে হবে....নিশ্চয় কিছু মনে করবেন না....আর কারুর ওপিনিয়ন.....তাহলে আমি নিশ্চিত হতে পারব....পুলিশ সার্জন....এসব ভালই বোঝেন....একটা ফোন করা দরকার।"

কালো একটা পুলিশের গাড়ি এসে বাড়ির সামনে থামবে। পুলিশের ডাক্তার গাড়ি থেকে নামবে, সঙ্গে একজন ইন্সপেক্টর কি সার্জেন্ট। তারপর প্রশ্ন, প্রশ্ন, প্রশ্ন।

আপনার নাম? স্ত্রীর নাম? বয়স? তার সঙ্গে আরো যাবতীয়। ডাক্তাররা যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলবে তখন ইন্সপেক্টর বা সার্জেন্ট তার সঙ্গে কথা বলতে থাকবে ঃ পোশাকী সমবেদনা, বিনয় সহকারে।

আপত্তি করবেন কি, ওরা যদি এই সময়টায় ফ্ল্যাটে ঘুরে-ফিরে একটু দেখে? সার্চ? ওহ্ না। শুধু একটু এধার-ওধার দেখা।

যাই বলুক ওটা আসলে সার্চই। প্রথমে তাকগুলো। কিছুই নেই, ভ্রূ কোঁচকাবার মত কিছুই নেই। শোবার ঘরে। ড্রেসিং টেবিলে প্রসাধনের জিনিসগুলো, তারপর ড্রয়ার, এরপর রান্নাঘর। কিছুই নেই।

বসার ঘর।

আলমারি, বইয়ের র‍্যাক।

আপনার স্ত্রী কি হজমের গোলমালে ভুগছিলেন? উনি কি খালি ওষুধের কৌটাগুলো জমান?

আচ্ছা, এই যে খালি কৌটাটা উনি বইয়ের পিছনে রেখেছেন, এ সম্পর্কে আপনার কি মনে হয়?

গন্ধ শুঁকবে। অবশ্যই গন্ধ নেই। সন্দেহ করারও কিছু নেই। কিছু গুঁড়ো কৌটার ভিতরের দেয়ালে লেগে আছে।

এটা বরং নিয়েই যাচ্ছি।

অ্যানালিসিসে অজানা বিষের খোঁজ পাওয়া যাবে। সাধারণ গেরস্ত বৌ এ বিষ পেল কোথা থেকে? আর যদি চিত্রার সঙ্গে তার প্রেমের ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায় পুলিশ দুই আর দুয়ে চার মেলাবেই-তাহলে?

তাহলে কি হবে!

কিছুক্ষণের জন্য অরোর মনে হল, এই রাতেই কৌটা সরিয়ে ফেলার সমস্যাটা সমাধান অসম্ভব। বাথরুমের বন্ধ দরজাটার দিকে তাকিয়ে তার মনে হতে লাগল, পুরো ব্যাপারটাই তাকে নাকচ করতে হবে।

বড় বেশি ঝুঁকি।

শুধু নিজের ব্যাপারই তো নয়, চিত্রাও জড়িয়ে পড়বে। নিশ্চয় চিত্রার বাড়িতেও পুলিশ যাবে। চারদিকে ঢিঢিক্কার পড়বে। পড়বেই। ওর অভিনয়ের দিক থেকে ক্ষতি হবে। ওকে বাড়ি ছাড়তে হবে।

"বড় বেশি ঝুঁকি"-অরো ফিসফিস করল। "বড় বেশি ঝুঁকি"।

ঘটে যাবার আগেই সে যে সবকিছু কল্পনায় খুঁটিয়ে দেখে নিতে পেরেছে, এতে আশ্বস্ত বোধ করল। এরকমভাবে কিছু করা যায় না। শুধু আজকের রাতের মত নয়, বরাবরের জন্যই ব্যাপারটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল। কেননা, এইসব সমস্যা পরেও তো উঠবে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে অরো শোবার ঘরে এল। নন্দা বাথরুমে যাবার জন্য তৈরী হয়ে রয়েছে। বসার ঘরে এসে অরো সিগারেট ধরাল।

এখন সে স্বস্তিবোধ করছে। জীবন-মৃত্যু সম্পর্কে যে ধারণাই তার থাক, বিশেষ অবস্থায় মানুষ হত্যায় সে যতই উদাসীন হোক, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে মামলা আর ফাঁসির ঝুঁকি নেয়াটা অন্য ব্যাপার। ভবিষ্যতে কি হবে বা না হবে তা সে জানে না। কিন্তু এখনকার মত কিছু করার নেই। এই চিন্তার বসে অরো ঢিলেঢালা আমেজ পেল। যন্ত্রটা বন্ধ হয়ে গেছে সেই সঙ্গে সারবদ্ধ ঘটনাও।

"খুচরো পয়সা আছে, একটা সিকি?" দরজার কাছ থেকে নন্দা বলল। "মিসেস চ্যাটার্জির চাকর বাজারে যাচ্ছে, মৌরী আনতে দেব।"

অরো পকেটে হাত ঢুকিয়ে কিছু খুচরো বার করল। তার থেকে একটা সিকি তুলে নন্দার হাতে দিয়ে খুচরোগুলো রাখার সময় আচমকা মনে হল, এভাবেই তো সমাধান করা যায়। পকেটটা তো রয়েছে। এখানেই কৌটাটা রাখা যেতে পারে। পরদিন বেরিয়ে কোথাও গিয়ে ফেলে দিলেই হল।

খুবই সহজ। ভাবামাত্র অরোর মনে আবার জেঁকে ধরলো চিন্তাগুলো।

ডাক্তার বাবু যাই ভাবুন, পুলিশ যাই ভাবুক, তাকে গ্রেফতার করার মত প্রমাণ কিছুই এই ফ্ল্যাটে পাবে না। বিষ প্রয়োগের মামলায় গ্রেফতার সঙ্গে সঙ্গেই হয় না। অটোপ্সি হবে, খুনের উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতি নিয়ে পুলিশ আগে নিশ্চিত হবে। এজন্য সময় লাগবে। করোনারি থ্রম্বসিস অনুমান করা হচ্ছে এমন ক্ষেত্রে, মৃত্যুর দু'এক ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশ তার পকেট সার্চ করবে এবং জাজ্বল্য প্রমাণ ছাড়াই, হতে পারে না।

দাঁতালো চাকাগুলো ঘুরছে, যন্ত্র আবার চলতে শুরু করেছে। অরো বুঝল আর তার পালাবার পথ নেই। এবার সে এগোবে। কেননা, এগোতেই হবে। জীবনে সে কর্মক্ষেত্রে ব্যর্থ, সাহসী নয়, নিজের উপর আস্থাও নেই। সাফল্যের কোন হাতিয়ারই তার নেই। কিন্তু এবার সে অন্তত প্রমাণ দেবে, দরকার হলে পুলিশ আর সমাজকেও টক্কর দিতে পারে। চিত্রাকে সে পাবে। বছরের পর বছর যে অহংবোধ মার খেয়ে এসেছে তাকে সে এভাবেই খুশি করবে। এখন যদি সে ভয়ে পিছিয়ে যায় তাহলে নিজের কাছেই সে খতম হয়ে যাবে। নিজেকে প্রমাণ দেবার চরম পরীক্ষায় তাকে নামতেই হবে।

খুনের উদ্দেশ্যে এবং অজুহাত নিয়ে সে এতদিন নানা যুক্তি খাড়া করেছিল। এবার অন্য একটা কিছু তার চেতনার তলদেশ থেকে ধীরে ধীরে ভেসে উঠেছে। হতাশা, গ্লানি, আত্ম-অহংকার টেনে তুলছে সেটাকে। শিল্প, বাণিজ্য, খেলা, রাজনীতির জগতে যারা বিজয়ী, অন্য মানুষকে হারিয়ে যারা নাম করেছে তাদের সঙ্গে একই সারিতে থাকার প্রবল ইচ্ছা তার মধ্যে জেগে উঠছে।

কিন্তু ওরা জিতেছে উন্মুক্ত ক্ষেত্রে, সকলের চোখের সামনে। সে বিজয়ী হবে গোপন রণক্ষেত্রে, অন্ধকারের মধ্যে লড়াই করে। এ যুদ্ধে শিকারের লক্ষ্য একমাত্র নন্দা, যে তাকে বিশ্বাস করে।

বাথরুমের মেঝেয় বালতি পড়ার শব্দ হল। অরো চেয়ার থেকে উঠে বারকয়েক পায়চারি করে শোবার ঘরে এল। ওষুধের কৌটাটা খাটের পাশে টেবিলের উপর একইভাবে রয়েছে। সেটা নিয়ে রান্নাঘরে ঢোকার আগে সে বাথরুমের বন্ধ দরজার দিকে তাকাল। নন্দা একটু বেশী সময়ই নেয়। মিনিট পনেরোর কমে ও বেরোবে না।

এখন নিজেকে অদ্ভুত রকমের বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ বোধ করছে অরো। যেন খুব কাছের থেকে অরবিন্দ ভাদুড়ি নামে একটি লোকের কাজ-কর্ম সে দেখে চলেছে। কৌটা থেকে চামচখানেক ওষুধের গুঁড়ো বেসিনে ফেলে দিল যে লোকটি, জল দিয়ে বেসিনে লেগে থাকা গুঁড়ো ধুয়ে দিল যে লোকটি, সেই মানুষ যে সে নিজেই এটা তার কাছে সত্য বলে মনে হচ্ছে না।

কৌটায় আর কতটা রইল, সেটা ভাল করে অরো দেখল। চামচ তিনেক প্রায়। এর থেকে দু'চামচ নন্দা খাবে। কি ভেবে সে, আর একটু গুঁড়ো ফেলে বেসিনটা ধুয়ে দিল। যতটা রইল সবটাই ওকে খেতে হবে।

পকেট থেকে পুরিয়াটা বার করে সে সাবধানে কাগজের পাট খুলে তাকে রাখল। মেঝের থেকে দেশলাইয়ের পোড়া কাঠি কুড়িয়ে, তার ডগা দিয়ে যতটা ওঠে, বিষ তুলে সে কৌটায় ফেলল। কাঠিটা দিয়ে নেড়ে গুঁড়োর সঙ্গে মেশাল মিনিট দুয়েক ধরে। তারপর মনে হল, বিষটা যদি কম হয়! অল্পতে যদি কাজ না হয়! কাঠি দিয়ে আর একটু তুলে কৌটায় দিল। আবার মিনিট দুয়েক নেড়ে কৌটায় ঢাকনি আঁটল। কাঠিটা রান্নাঘরের জানালা দিয়ে ফেলে দিল। পুরিয়ার কাগজ ভাঁজ করে পকেটে রাখল।

কাজ চুকে গেল।

জিনিসটা এখন কৌটার মধ্যে। কৌটাটা বিছানার পাশে টেবিলে যে অবস্থায় ছিল, ঠিক সেইভাবেই অরো রেখে

দিল। সারা ঘরে চোখ বোলাল সে। বসার ঘরে এল। এখানেও সে খুঁটিয়ে সারা ঘর দেখল। আর বড়জোর একটা রাত ঘরটা এই রকম থাকবে।

মাসখানেক অন্তত চিত্রার থেকে দূরে থাকতে হবে। ও বুঝবে কেন দূরে থাকছি। ভাববে, শোক মোচন করতে একা থাকতে চাইছি। ছ'মাস, এক বছর বিয়ের ব্যাপারটা পিছিয়ে দিতে হবে। তাড়াহুড়ো করলে কথা উঠবে, কানাকানি হবে, সন্দেহ রটবে, পুলিশের কানে যাবে। হয়তো গোপনে তদন্ত শুরু করবে।

তবে অত দেরীতে তদন্ত করে কিছুই পাবে না। তাহলেও সাবধানের মার নেই। বেরোবার জন্য তৈরী হয়ে অরো অপেক্ষা করতে লাগল।

স্নান সেরে নন্দা বাথরুম থেকে বেরোল। মসৃণ তেলা চামড়ার উপর ফোঁটা ফোঁটা জল। তাজা প্রফুল্ল মুখমন্ডল। মৃদু সৌরভে ঘরটা ভরে যাচ্ছে।

"বেরোচ্ছি। বাইরেই এ বেলা খেয়ে নেব। রাতে নেমন্তন্ন আছে, এক বড় কোম্পানির পিআরও'র ছেলের পৈতে, বেহালায়। এই এক ঝামেলা, না গেলেও নয় অথচ রাতে অত দূর থেকে ফেরাও এক ঝঞ্ঝাটের।"

"কত রাত হবে?"

"জানি না, তবে সাড়ে এগারোটার মধ্যেই ফিরব, নয়তো বাস পাব না।"

"কিছু একটা দিতে হবে তো।"

"হবেই। বইটই কিনে নেব।"

"সারাটা দিন আমায় একা থাকতে হবে।"

"সিনেমায় যেতে পারো তো।"

"তাছাড়া আর কি করার আছে।"

কথা বলতে বলতে দু'জনে বাইরের দরজার কাছে এসেছে।

"সাবধানে থেকো। মতি কবে আসবে, পরশু?"

"তাই তো বলে গেছে।"

"সাবধানে থেকো।"

দরজা খুলে অরো, সাবধানে ভেজিয়ে দেবার সময় দেখল নন্দা তাকিয়ে আছে তার দিকে। মৃদু হাসল।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে অরো সামান্য বিব্রত হল। মনের মধ্যে কিছুই হচ্ছে না তার। না দুঃখ, না আবেগ। আগাগোড়াই সে শীতল, অনুত্তেজিত ভঙ্গিতে জনৈক অরবিন্দ ভাদুড়ীকে যেন দেখে যাচ্ছে। দৃশ্যের মধ্যে অরোর নিজের কোন অংশ নেই। মনে হচ্ছে অন্যান্য দিনের সকালের মতই আজকের সকালটাও। অন্যান্য রাতের মতই হয়তো আজকের রাতেও ফিরে এসে দেখবে নন্দা বই পড়ছে কি রেডিও শুনছে।

অরো ভেবে পাচ্ছে না, আসলে সে কতটা অস্বাভাবিক হয়ে পড়েছে। বাড়ী থেকে সে বেরোল কপালে উদ্বিগ্ন কয়েকটি কুঞ্চন নিয়ে।

দুপুরে অ্যাডভয়েস থেকে বেরিয়ে মাইলখানেক হেঁটে সে এক ছোট ওষুধের দোকানে ঢুকল।

ভিড় নেই। মাঝ বয়সী একটি লোক চুপচাপ রাস্তার দিকে তাকিয়ে বসে আছে কাউন্টারে।

"সিকোজাইম দিন তো।"

"বড় না ছোট কৌটা?"

অরো মুশকিলে পড়ল।

কোন্‌টা? কোন্‌ মাপের কৌটা? বাড়ীতে যেটা রয়েছে সেটা ছোট না বড়? এসবই হচ্ছে অজানা, অদেখা বিপদ।

না শোনার ভান করে সে জিজ্ঞাসা করল, “কি বললেন?”

“বড় না ছোট কৌটা দেব?”

“ছোট।”

দেখলেই চিনতে পারবে। যদি ছোট হয় তাহলে বলবে বড় চাই। না থাকলে অন্য দোকানে যাবে।

আলমারি থেকে দোকানি যেটা বার করল, অরো দেখেই বুঝল এটা ঠিক মাপেরই। দাম চুকিয়ে সে আবার হেঁটে অ্যাডভয়েসে ফিরে এল।

দুপুর গড়িয়ে বিকেলে পৌঁছল।

এক সময় অরোর মনে হল, হয়তো নন্দা রাত পর্যন্ত অপেক্ষা না করে এখনই ওষুধ খেয়েছে। হয়তো দুপুরে ভাত খাওয়ার পরই দরকার বোধ করেছে। বলা যায় না। হয়তো এতক্ষণে ও মারা গেছে।

এই নিয়ে ভাবনা শুরু হতেই ওর বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা পড়তে শুরু করল। কিছুক্ষণ পর আর সে ধৈর্য রাখতে পারল না। ফোন করল মিসেস চ্যাটার্জির ফ্ল্যাটে।

ওধার থেকে প্রৌঢ়ার ধীর গম্ভীর স্বর শুনে বলল, “আমি অরবিন্দ। একবার নন্দাকে ডেকে দেবেন?”

“দিচ্ছি।”

রিসিভার কানে চেপে ধরে অরো বসে রইল। মস্তিষ্ক অসাড় হয়ে আসছে। নন্দা এসে কথা বলবে, নাকি মিসেস চ্যাটার্জিই বিব্রত কণ্ঠে বলবেন, “অনেকক্ষণ বেল টিপলাম কিন্তু ভিতর থেকে তো কেউ সাড়া দিচ্ছে না।”

যদি তাই বলে তাহলে সে বলবে, “থাক, হয়তো ঘুমোচ্ছে। আপনি ব্যস্ত হবেন না। পরে দেখা হলে বলে দেবেন আমার ফিরতে রাত হবে।”

এত দেরী হচ্ছে কেন ওধারে। দরজা কেউ খুলছে না দেখে কি উনি চেঁচামেচি করে লোক জড়ো করবেন? সর্বনাশ! দরজা ভেঙ্গে ওরা যদি নন্দাকে মৃত দেখে, তাহলে আগেই তো পুলিশকে খবর দেবে। পুলিশ এসে প্রথমেই কৌটাটা পাবে। অরো রেগে উঠল নিজের উপর। কেন ফোন করলাম।

“হ্যালো, আমি নন্দা।”

“এত দেরী হল কেন?” অধৈর্য বিরক্ত স্বরে অরো বলল, “কি করছিলে?”

“বাথরুমে ছিলাম।”

“কেন, হজমের কিছু হয়েছে?”

“নাতো, রুমাল আর মোজাগুলো সাবান জলে দিচ্ছিলাম।”

“তোমার ওষুধটা কিনেছি।”

“না কিনলেও চলতো। যতটুকু আছে আজ খেয়ে নেব। আর খাওয়ার দরকার হবে না। ফোন করছ কেন?”

“দরজার ছিটকিনিটা তুলে রেখো। যদি রাত হয়, তাহলে বারবার বেল বাজিয়ে তোমায় তোলার দরকার হবে না।”

“আমার ঘুম পাতলা।”

“তা হোক।”

“আচ্ছা।”

“রাখছি, কেমন?”

রিসিভার রেখে অরোর মনে হল, এই শেষবার নন্দার কণ্ঠস্বর সে শুনে নিল।

কিছুক্ষণ পরই তার ভ্রূ কুঞ্চিত হল। বাইরের দরজাটা টেনে ধরলেই খাড়া করে রাখা আলগা ছিটকিনিটা পড়ে যায়। দরজা ঠেলে সে ভিতরে ঢুকে নতুন কৌটাটা রাখবে। কৌটা থেকে খানিকটা ওষুধ আগেই অবশ্য ফেলে দিতে হবে। তারপর পুরনোটা পকেটে পুরে নেবে।

কিন্তু নতুন কৌটায় কার আঙুলের ছাপ থাকবে? তার নিজেরই। অথচ থাকার কথা নন্দার, সে ওটা থেকে ঢেলে নিয়ে খেয়েছে। নন্দা কখনোই ওটা হাতে ধরার সুযোগ পাবে না। তার আগেই সে মৃত। এই হচ্ছে অজানা ফাঁদ আর সে কিনা এতে পা দিয়ে ফেলেছিল! অরো ভাবল, আমি সত্যিই একটা গাড়োল।

ব্যাপারটা অবশ্য সামলে নেয়া যায়। কিন্তু যেভাবে তা করতে হবে ভাবতেই সে বিষণ্ণ বোধ করল। নন্দার অসাড় মৃত হাতটা নিয়ে তার আঙুলগুলো কৌটায় চেপে ধরতে হবে। ডান হাতের আঙুলগুলো ঢাকনিতে, বাঁহাতের আঙুলগুলো কৌটাটা জড়িয়ে।

“অসম্ভব, ও কাজ আমার দ্বারা হবে না।” সে নিজেকে শুনিয়ে বলল। মাথার মধ্যে তখন ফিসফিস করে কে বলে উঠল, “সামান্য ব্যাপারে হেরে যাচ্ছ? এজন্যই তো তুমি জীবনে ব্যর্থ।”

দীর্ঘশ্বাস ফেলল অরো, সে জানে শেষ পর্যন্ত এটা তাকে করতেই হবে।

রাত অন্তত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত অরোকে বাইরে কাটাতে হবে। কোথায়, কিভাবে, কার সঙ্গে কাটাবে এতক্ষণ। চেনাশোনা লোকেদের সঙ্গে থাকার ইচ্ছে তার নেই। সে জানে, ফ্ল্যাটে গিয়ে নন্দাকে মরতে দেখা তার পক্ষে সম্ভব নয়। হয়তো শেষ মুহূর্তে ‘খেয়ো না খেয়ো না’ বলে কোন একটা ছুঁতো দেখিয়ে গ্লাসটা সে কেড়েই নেবে।

বুড়োকে চোখের সামনে সে মরতে দেখেছে। শুকনো মনে নন্দার মৃত্যু নিয়ে চিন্তাও করতে পারে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। যুক্তি দিয়ে কাজটার যথার্থতা হয়তো বোঝাতে পারে, কিন্তু ফলাফল দেখার জোর তার নেই।

চিত্রাকে মনে পড়ছে তার। ওর কাছে গেলে হয়তো ওর সঙ্গ তাকে এই কয়েক ঘণ্টা কাটাবার মত মনের জোর দিতে পারে।

অরো বাসে শেয়ালদার মোড়ে এসে ঘড়িতে দেখল মাত্র ছ’টা। চিত্রা অন্তত আটটার আগে বাড়ি ফিরবে না। এই দীর্ঘসময় কোথাও বসে কাটানো মানেই চিন্তাগুলোকে জোঁকের মত মাথায় লাগানো। তার থেকে বরং হাঁটাই ভাল। যতদূর পারবে হাঁটবে, তারপর বাসে উঠে পড়বে।

কিন্তু যা ভেবেছিল, মোটেই তা হল না। শেয়ালদার ভীড় কাটিয়ে মানিকতলার দিকে হাঁটতে শুরু করেই সে ভাবনার মধ্যে ডুবে যেতে থাকল।

কি এমন অন্যায়! অরো ভাবল, এভাবে বিনা যন্ত্রণায় মরাই তো ভাল। এটা তো করুণাবশতই সরিয়ে নেয়া। অনেক দেশেই দেহের অক্ষমতার যন্ত্রণা থেকে চিরতরে মুক্তি দিতে নিঃসাড়ে হত্যা করা হয়। বহু দেশের সমাজ এটা ক্ষমার চোখেই দেখে। তাহলে মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য নয় কেন? অরো তার পুরনো যুক্তিটা ঝালাতে চলল।

এক সময় তার মনে হল, ভগবান বলে কেউ আছে কি? থাকলে, এখন তার সম্পর্কে কি ভাবছে? তার কাজটার জন্য নরকে না স্বর্গে পাঠানো হবে? কাজটা অবশ্যই যুক্তিপূর্ণ, মানবিক তো বটেই। কিন্তু মানবিকই যদি হয়, তাহলে মনটাকে এখন অন্যদিকে, চিত্রার সঙ্গ পাওয়ার দিকে, সরিয়ে নেবার জন্য সে এত পথ হাঁটতে যাচ্ছে কেন? বুক ফুলিয়ে বসে থাকতে পারত।

অপঘাতে মরলে নাকি প্রেত হয়ে বেঁচে থাকে। নন্দা প্রেত হবে? প্রতিশোধ নিতে ওকে গলা টিপে ধরবে? বহুকাল আগে এইরকম একটা ব্যাপার সে দেখেছে। একটা কঙ্কাল গলা টিপে মারল ভিলেনকে। ভিলেনের পাট করেছিল ধীরাজ ভট্টাচার্য। নন্দাকে অবশ্য পুড়িয়ে দেয়া হবে। লোকজন যোগাড় করতে হবে। ওসব ব্যবস্থা চিরোই করে দেবে।

ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর অরো একটা চায়ের দোকানে ঢুকে বসল। একটা ডবল-হাফ দ্রুত খেয়েই সে আর একটা দিতে বলল। ধূমায়িত আর এক কাপ আসতেই সে মুখ তুলেও নামিয়ে রাখল।

এত তাড়াতাড়ি খাওয়াটা উচিত নয়। একটু একটু চুমুক দিয়ে খাওয়া দরকার। প্রথম কাপ এত তাড়াতাড়ি শেষ করেই সঙ্গে সঙ্গে আর এক কাপ চেয়ে সে ইতোমধ্যেই বোকামি করেছে। যদি পরে কিছু গোলমাল ঘটে, যদি পলাতকের সন্ধান চেয়ে তার ছবি কাগজে বেরোয়, যদি চা-ওয়ালাটা সেই ছবি দেখে, আর যদি মনে পড়ে যায়, পরপর গরম দু'কাপ চা খেয়েছিল এই লোকটাই- তাহলে কি হবে?

কোর্টে এই লোকটাই সাক্ষী দিয়ে বলবে, হুজুর, আমার ঠিকই মনে আছে। অমন চৌকো চওড়া মুখ আর মোটা চশমা সহজে ভোলা যায় না। সেদিন খদ্দেরপাতিও বেশী ছিল না। কি যেন ভাবছিল, বিড়বিড় করছিল আর গরম চা খুব তাড়াতাড়ি খাচ্ছিল।

উকিল ব্যাপারটাকে এমনভাবে বোঝাতে চাইবে যেন গরম দু'কাপ চা তাড়াতাড়ি শুধু খুনীরাই খায়। চৌকো চওড়া মুখ আর মোটা চশমা যেন পৃথিবীতে এক জনেরই আছে, তাই দেখামাত্রই চেনা যায়।

অরো ধীরে ধীরে দ্বিতীয় কাপ শেষ করে রাস্তায় বেরিয়ে এল।

শ্রীপুর কলোনীতে পৌঁছল সাড়ে আটটায়। ঘুটঘুটে অন্ধকারে কলোনীটা ডুবে রয়েছে, লোডশেডিং, বাড়ীগুলোর জানালা দিয়ে হারিকেন আর মোমবাতির হলদেটে ম্লান আলো দেখা যাচ্ছে। গরমের জন্য রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে অনেক লোক।

চিত্রাদের বাড়িতে অরো অপরিচিত নয়। অনেকবার দুপুরে বা রাত্রে খেয়ে গেছে। সময় কাটিয়েছে দোতলায় চিত্রার ঘরে গল্প করে। ওকে এই সময়ে শ্রান্ত চেহারায় দেখে চিত্রা নিশ্চয়ই অবাক হবে।

'কি ব্যাপার, আপনি?' চিত্রার বদলে চিত্রার বোন। হারিকেনটা একটু তুলে ধরে অবাক মুখে তাকিয়ে। 'দিদি তো মাকে নিয়ে বিকেলেই বেরিয়েছে। নটা-সাড়ে নটা নাগাদ আসবে।'

'ওহ্, আমার একটু দরকার ছিল। আচ্ছা, ঘুরে আসছি।'

অরো তার শ্রান্ত দেহটাকে নিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। একা বাড়িতে চিত্রার বোন। নয়তো সে বলতো, চেয়ার দাও বাইরে চাতালটায় বসছি।

ঘড়িটা চোখের কাছে তুলেও সময় দেখতে পেল না। আর কত বাকি? আড়াই ঘণ্টা-তিন ঘণ্টা? দিন-বছর। যদি কতকগুলো বছর কম আর বেশী হয়, কি আসে যায়?

একটা অন্ধকার রকের উপর বসল। পেছনের জানালাগুলো বন্ধ। বাড়িতে কেউ নেই বোধ হয়। চোর ভাববে না তো তাকে? ভাবুক, আজ মনের জোর পরীক্ষা করার রাত। দেয়ালে হেলান দিয়ে সে চোখ বন্ধ করল।

তন্দ্রা এসেছিল অরোর। এক সময় তার মনে হল কেউ হিপপকেট থেকে পুরিয়াটা তুলে নিচ্ছে চুপিচুপি। ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল সে। অন্ধকারের মধ্যেও টের পেল একটা কুকুর তার পেছনে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে। তাকে দ্রুত দাঁড়াতে দেখে বেচারা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে বসল।

ক'টা বাজে? এখনও কেন অন্ধকার? কুকুরও কি মরে ভূত হয়? অরো আবার চিত্রাদের বাড়ির পথ ধরল। বারুইপুরের বাড়িটা সে কি করবে? নন্দা মারা গেলে ওটা তারই হবে। বিক্রিই করে দেবে, ওখানে গিয়ে আর বসবাস করা যাবে না। কিংবা নন্দার দাদাদেরই ফিরিয়ে দেবে। সেটাই ভাল দেখাবে।

চিত্রা ফিরেছে। গীতার কাছেই সে শুনেছে অরো এসেছিল এবং আবার আসবে।

‘ব্যাপার কি? এত রাতে!’

‘কিছু না, এমনিই। হঠাৎ ইচ্ছে হল। তুমি কোথায় গেছলে মাকে নিয়ে?’

‘মাকে মেজমাসীর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে রিহার্সালে গেছলাম। হল না রিহার্সাল, ওদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি– যাকগে, বাইরেই বোসো। ঘরে বড্ড গরম।’

বাড়ির সামনের চাতালে দুটো চেয়ার পেতে ওরা বসল। হারিকেনটা দরজার কাছে রাখা যাতে বাড়ির ভেতরে ও বাইরে আলো পড়ে।

‘খিদে পেয়েছে?’

খিদে! শব্দটা অরো যেন এই প্রথম শুনল। পাকস্থলী অসাড় হয়ে রয়েছে, খিদের কোন বোধই নেই। তার মনে হচ্ছে এক বছর তার খাওয়ার কোন দরকার হবে না।

মাথা নাড়ল সে।

‘শুধু জল খাব। শরীরটা ভাল লাগছে না।’

অরোর কপালে হাত রেখে তাপ বুঝতে চেষ্টা করল চিত্রা।

‘না, জ্বরটর হয়নি।’ বলে সে জল আনতে গেল।

জল খেয়ে গ্লাসটা চিত্রার হাতে দিয়ে অরো ‘আহ্‌হা’ করে উঠতেই চিত্রা গ্লাসটা মেঝেয় রেখে চেয়ারে বসে বলল, ‘চিন্তিত দেখাচ্ছে, কিন্তু কি হয়েছে? নন্দা কেমন আছে?’

বিস্মিত হয়ে অরো তাকাল।

‘কেন? হঠাৎ নন্দার কথা?’

চিরোকে দেয়া কথা ভুলে চিত্রা বলে ফেলল, ‘ওর হার্টের অসুখ আছে না? একবার তো ডাক্তারও ডাকতে হয়েছিল।’

‘হ্যাঁ, হয়েছিল একবার।’

অরোর মনে হয় নন্দার করোনারি থ্রম্বসিসের খবরটার জন্য চিত্রাকে আগাম তৈরী করে রাখলে কেমন হয়? তারপর ভাবল, থাক বেশী চালাক হয়ে কাজ নেই। আবার মনে হল, কেনই বা নয়? ক্ষতিটা কি?

‘হার্ট ব্যাপারটা একটু গোলমেলে।’

‘হুঁ।’

‘আজ কেমন চুপচাপ দেখছি যেন তোমায়?’

‘কারণ আছে।’

‘রিহার্সাল হল না বলে?’

‘অরো, যা বলব তাতে আমায় ভুল বুঝো না। চিত্রা কোলে দুই মুঠো রেখে চাপা স্বরে বলল, ‘তুমি আমার কাছে যতটা, আর কেউ তা নয়।’

অরো নিথর হয়ে অপলক তাকিয়ে রইল থেমে যাওয়া চিত্রার দিকে। গুরগুর করে উঠছে বুক। একটা বিরাট ঢেউ বোধহয় পাথরের গায়ে আছড়ে পড়তে চলেছে। তার ধ্বনিটা ক্রমশই এগিয়ে আসছে তার বুকে, মাথায়, সর্বাঙ্গে– এমনকি আঙুলের ডগাতেও প্রতিধ্বনি।

চিত্রা এবার সোজা তাকাল অরোর মুখে। হাত বাড়িয়ে আলতো করে ধরল অরোর বাহু।

‘অরো, আমার মনে হয় না এভাবে কিছু করা উচিত। কয়েকটা দিন আমি ভাল করে ভেবে বুঝেছি নন্দার প্রতি অন্যায়ই করা হবে, সব থেকে বড় কথা ওর জীবনও বিপন্ন হতে পারে।’ ইতস্তত করে যোগ করল চিত্রা, ‘তোমার বা আমার প্রতিও অন্যায় করা হবে।’

ঢেউটা ফিরে গেছে, শুধু পড়ে আছে ক্ষয়ে যাওয়া রুক্ষ পাথরটা। কিন্তু গুরগুর শব্দটা অরোর বুকের মধ্যে দ্বিগুণ জোরে ধ্বনিত হচ্ছে।

‘তুমি কি বলছ চিত্রা! কেন এসব কথা এখন উঠছে? প্লিজ আজ নয়। এখন এসব বলে আমাকে ধসিয়ে দিও না।’

‘তুমি কি চাও, তোমার ধস বন্ধ করতে তোমায় বিয়ে করি? কর্তব্যবোধ থেকে বিয়ে করা উচিত, এটাই কি বলতে চাও?’

‘মোটেই নয়।’ পাংশু মুখটা সে নিচু করল। হারিকেনের আলো তার চশমার কাচে প্রতিবিম্বিত হল।

‘তুমি কি এটা বুঝতে পারছ না, যদি নন্দার কিছু ঘটে, তাহলে আমরা নিজেদের কখনোই ক্ষমা করতে পারব না। সব সময় আমাদের দু’জনের মাঝখানে ও রয়েই যাবে।’

‘যাবে? মাঝখানে রয়েই যাবে?’ তিক্তস্বরে অরো বলল। ‘নাটক-নভেলে এসব পড়েছি, সব সময় দু’জনের মধ্যে ওর অস্তিত্ব অনুভব করা, দু’জনের মাঝে ছায়া ফেলে থাকা, সুখকে তেঁতো করে দেয়া। কিন্তু এমন কি সত্যিই হয়?’

‘অন্তত আমি ঝুঁকি নিতে পারব না।’

এত মতলব, এত দ্বিধা-ভয়, সাবধানতা সবকিছুই নিরর্থক হতে চলেছে। নন্দার মৃত্যুর খবর যখন চিত্রা পাবে, কি ভাববে? ভাববে অরোই এটা ঘটিয়েছে। চিত্রার সঙ্গে তার ব্যাপারটা নন্দাকে বলেছে, আর শোনামাত্র নন্দা হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে। তাহলে চিত্রা কখনোই তাকে বা নিজেকে ক্ষমা করবে না।

‘আমি জানি তুমি আঘাত পাবে, তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি, এভাবে আমি বিয়ে করতে পারব না। এভাবে নয়।’

‘এভাবে নয়।’ অরো মৃদুস্বরে পুনরাবৃত্তি করল। নন্দার যখন বুক ধড়ফড়ানি হয়েছিল, তখন অনেকটা এভাবেই সে বলেছিল।

‘তুমি কি পাকাপাকি সিদ্ধান্তে এসে গেছ?’ অরো বলল।

‘হ্যাঁ, এ আর বদলাবে না।’

একটু ভেবে অরো বলল, ‘বেশ। তাহলে এবার আমরা কি করব?’

‘আমার মনে হয়, পরস্পরকে ভুলে যাবার চেষ্টা করাই ভাল। কোন দিন আমাদের দেখা হয়নি, এই রকম যদি ভাবতে পারি।’

‘বেশ।’

‘আমি কি কিছু ভুল বলেছি।’

‘না, না, ঠিকই বলেছ। এবার আমি যাই।’

‘তুমি রাগ করেছ অরো?’

‘অনেক আগে এটা জানালে ভাল করতে।’

চিত্রার সিদ্ধান্ত তাকে যা কিছু বেদনা দিয়েছে, তা অসাড় হয়ে আসছে এখন মারাত্মক একটা ভয়ে। নন্দা কেন অকারণে তাহলে মারা যাবে? এখুনি তাকে যেতে হবে, এখুনি এখুনি...

হাত তুলে ঘড়ির দিকে তাকিয়েই অরো আতঙ্কে জমে গেল। আর মাত্র আধঘণ্টা, তারপরই হয়তো নন্দা মিকোজাইমের কৌটোর দিকে হাত বাড়াবে।

লোহার ছোট্ট গেটটা খুলে বেরোবার সময় অরো কয়েক সেকেন্ডের জন্য ঘুরে দাঁড়াল।

'না, আমি একটুও রাগ করিনি।'

স্বাভাবিক স্বরে কথাগুলো বলে সে বেরোতে যাচ্ছে, তখনই ইলেকট্রিক আলো জ্বলে উঠল সারা অঞ্চলে। চিত্রার দেহে আলো পড়েছে। অরো বিষণ্ন চোখে কয়েক সেকেন্ড ওর দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে এল। ছোটবেলা থেকে যে ভালবাসার স্বপ্ন সে দেখে এসেছে আর কোনদিনই তা সম্ভব হবে না। চিত্রাই তার শেষ ব্যর্থতা।

অরো নিজের জন্য করুণাবোধ করল জীবনে এই প্রথম।

ভিআইপি রোডের উত্তরে ও দক্ষিণে অরো তাকাল। কুড়ি-পঁচিশ সেকেন্ড অন্তর এক একটি গাড়ী চলে যাচ্ছে, কিন্তু তার একটাও ট্যাক্সি নয়।

অধৈর্য হয়ে ঘড়ি দেখল। আর কুড়ি মিনিটের মধ্যে যদি ফ্ল্যাটে পৌছতে পারে– কিন্তু অসম্ভব। ট্যাক্সি পেলেও অসম্ভব। এখান থেকে এন্টালি, উড়িয়ে নিয়ে গেলেও ট্যাক্সি আধঘণ্টার আগে পৌছে দিতে পারবে না। হয়তো নন্দা আজ দেরী করেই ওষুধটা খাবে। যদি সে তখন বসার ঘরে থাকে, তাহলে শোবার ঘরে গিয়ে পুরনো কৌটোটার বদলে নতুনটা রেখে দেয়া এমন কিছু শক্ত কাজ হবে না। পরে এক সময় পুরনো কৌটোটা রাস্তায় ফেলে দেয়া যাবে। সুতরাং আধঘণ্টা পর পৌঁছলেও ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা এখনো বন্ধ করা যেতে পারে। কিন্তু ট্যাক্সি কোথায়?

অরো দক্ষিণ দিকে হাঁটতে শুরু করল, একটু জোরেই। পেছনে মোটর ইঞ্জিনের শব্দ পেলেই থমকে যায়। তারপর দেখে লরি বা প্রাইভেটকার আসছে।

অরো জোরে, প্রায় ওয়াকিং রেসের প্রতিযোগীর মত এবার সে হাঁটতে লাগল। এখন তার মনে চিত্রা নেই, শুধু নন্দা আর একটি উদ্বেগ– তাকে এখুনি পৌঁছতে হবে। আবার ঘড়ি দেখল সে এবং প্রায় নির্জন রাস্তার একধারে দাঁড়িয়ে জিপটির অতিক্রম করে যাওয়া দেখে সিদ্ধান্তে এল, এখন ট্যাক্সি পেয়েও সে নন্দাকে বাঁচাতে পারবে না।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ অরোর মনে হল, কেউ তাকে লক্ষ্য করছে। চারধারে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না।

ভয় তাকে ঠাণ্ডা মুঠোয় টিপে ধরেছে। তার মনে হচ্ছে অন্ধকারের মধ্য থেকে কিছু একটা বেরিয়ে এসে ঘিরে ধরবে। কি হতে পারে সেটা? একটা দড়ি। গোল হয়ে তাকে ঘিরে ক্রমশ ছোট হতে হতে গলায় আটকে যাবে। নয়তো চারদিকে চারটে দেওয়াল। ক্রমশ এগিয়ে আসবে, আলো-বাতাস বন্ধ করে তাকে চেপে ধরবে। দম বন্ধ হয়ে সে মারা যাবে।

সম্ভবত নন্দার আগেই সে মারা যাবে। তাহলে নন্দাকে বাঁচাবে কে? একমাত্র উপায় টেলিফোন করে ওকে ওষুধটা খেতে নিষেধ করা। এখন তার দরকার একটা টেলিফোন। মনে হওয়া মাত্র অরো ছুটতে শুরু করল।

দু'ধারে তাকাল সে। একদিকে নিম্নবিত্তদের টালির বাড়ী, অন্যদিকে বিরাট পাঁচিল, ভেতরে কারখানা। একটি লোক আসছে সামনে থেকে। অরো দাঁড়িয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'বলতে পারেন, এখানে কোথায় ফোন আছে? ভীষণ দরকার, খুব জরুরী।'

'ফোওন!'

লোকটি তার দু'পাশে তাকিয়ে যেন খুঁজল। চিন্তিত স্বরে বলল, 'ফোন তো কাছাকাছি কোথাও নেই। আর একটু এগিয়ে দেখুন, ওষুধের দোকানে থাকতে পারে।'

অরো ছুটতে শুরু করল আবার। অ্যাশফাল্টের উপর জুতোর থপ্ থপ্ শব্দটাই এখন তার একমাত্র সঙ্গী। পাশ

দিয়ে মাঝে মাঝে মোটর চলে যাচ্ছে। সে দু'ধারে তাকাচ্ছে। মোটামুটি সম্পন্ন চেহারার একটা বাড়ীও যদি দেখতে পায়, তাহলে দরজা ধাক্কাবে।

'ও মশাই ছুটছেন কেন? কি হয়েছে?'

অরো থেমে গেল। হাঁফাচ্ছে।

জীবনে সে খেলাধুলা করেনি। কোনদিন এভাবে দৌড়ায়নি। হা করে শ্বাস টানতে লাগল। বাঁ পাশের ঝোপঝাড় থেকে এগিয়ে এল তিনটি ছেলে।

'ব্যাপার কি, দৌড়াচ্ছেন কেন?'

ওরা তাকে ঘিরে দাঁড়াল।

'ফোন করব, এখুনি কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারেন?'

'ফোন করবেন তো দৌড়াচ্ছেন কেন?'

'খুব জরুরী।'

'কি এমন জরুরী?'

'একজন মারা যাচ্ছে।' অরোর মনে হল সেই অজানা চোখ, যা তাকে লক্ষ্য করে যাচ্ছে মনে হয়ছিল, সে কি এরাই? 'ফোন করে হয়তো বাঁচানো যেতে পারে।'

'ব্যাপারটা কি? ফোন করে মানুষ বাঁচানো– ফোন কি ডাক্তার, ইঞ্জেকশন, অপারেশন?'

'বাড়ী কোথায় আপনার?'

'এন্টালি।'

'এন্টালি! এত রাতে এখানে কি করছেন?'

অরো ঘড়ি দেখল। দশটা পঞ্চাশ। নন্দা সম্ভবত এখন চুল আঁচড়াচ্ছে। শোবার আগে আয়নার সামনে বসে ও খুঁটিয়ে নিজের মুখ দেখে। ওর পাশের টেবিলেই কৌটোটা। যদি ও ওষুধটা খেয়ে নিয়ে চুল আঁচড়াবে ভেবে থাকে!

ওদের মুখের দিকে অরো তাকাল। অভুক্ত, ভোঁতা, নির্মম তিনটি মুখ। বয়স হয়তো ত্রিশের নিচেই।

'যদি কাছাকাছি ফোন থাকে তো বলুন, জীবন-মরণের প্রশ্ন এখন।'

ওদের মধ্যে দু'জন দৃষ্টি বিনিময় করল। অন্যজন চারধারে তাকিয়ে নিয়ে শিস দিল। 'আছে। আসুন নিয়ে যাচ্ছি।'

ওরা যেদিক থেকে এসেছে, সেই দিকেই অরোকে নিয়ে চলল। কাঁচা মাটির পথ, মাঠের মাঝদিয়ে। দূরে দু'চারটে বাড়ীর ছায়া। গ্রাম গ্রাম পরিবেশ। পিঠে ধাতব কঠিন খোঁচা পেল অরো।

'ব্যস।' পেছনের কণ্ঠস্বরে সামনের দু'জন দাঁড়িয়ে গেল।

'চুপ করে থাকুন।'

ওরা দ্রুত কাজ করে গেল। ঘড়িটা খুলে নিল, মানিব্যাগ এবং সিকোজাইমের কৌটোটা পকেট থেকে বার করল। কৌটোটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে গিয়ে দিল না।

'কি এটা, ওষুধ?'

অরোর পকেটে ফিরিয়ে রেখে দিল। হিপপকেটে আঙ্গুল ঢুকিয়ে খুঁজল এবং পুরিয়াটা বার করল।

'এটাও বোধ হয় ওষুধ।' একবার ওকে হিপপকেটে ফিরিয়ে দিল।

'যান এবার।'

'ফোন কোথায় পাব? সেটা একটু বলুন।'

ওরা অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে। শুধু দুটি কথা ভেসে এল– 'এগিয়ে, পেট্রল পাম্পে।'

শোনামাত্র ভিআইপি রোড লক্ষ্য করে সে ছুটল। রাস্কেলরা দেরী করিয়ে দিল। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে বাঁ হাত তুলল ঘড়ি দেখতে। কব্জি ঘিরে ফ্যাকাশে একটা দাগ। একটু এগিয়ে, তার মানে আরো দক্ষিণে ওইদিক দিয়েই হেঁটে এসেছে। মনে করার চেষ্টা করল, কোন পেট্রল পাম্প দেখেছে কিনা।

আবার ছুটতে গিয়ে বুকের মধ্যে তীক্ষ্ণ ব্যথা উঠছে। কিন্তু নন্দার চুল আঁচড়ানো হয়তো এতক্ষণে শেষ হয়েছে। অরো সামনেই পেট্রল পাম্পের আলো দেখতে ফেল।

টেবিলে বসা লোকটা হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল হঠাৎ একটা লোককে পাগলের মত এতরাতে ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকতে দেখে। ড্রয়ার বন্ধ করেই চাবি দিল।

'এমারজেন্সি।' বলেই অরো রিসিভার তুলে ডায়াল করতে থাকল।

এ-ধারে রিং হয়ে যাচ্ছে। চ্যাটার্জিরা তো দেরীতেই শোয়, তাহলে ধরছে না কেন? অন্য সময় তো ফোনের কাছাকাছিই থাকে বুড়িটা অথর্ব গাধা। অরো রিসিভারের হাতলটা মুঠোয় কচলাতে লাগল এবং সেই সময়ই তার মনের মধ্যে ক্ষীণ ডায়ালিং টোনের মত বেজে উঠল ঃ কি বলব আমি নন্দাকে? কি বলার জন্য ফোন করছি? এ আমি কি করতে চলেছি! স্বীকারোক্তি! আমি খুনী, এই কথা?

'হ্যালো।'

'আমি অরবিন্দ। নন্দাকে খুব দরকার। ডেকে দেবেন দয়া করে?'

'দেখছি।'

অরবিন্দ এইবার নিজমুখে বল তোমার অপরাধের কথা। অরো মরিয়া হয়ে ভাবল, যদি ইতোমধ্যে নন্দার কিছু হয়ে থাকে, তাহলে আর বলতে হবে না। বেঁচে যাবে সে। কিন্তু কার কাছ থেকে? ব্যর্থ, আজীবন ব্যর্থ আমি। একবারের জন্যও নিজেকে অনুভব করলাম না নায়ক হিসেবে, বিজয়ী বিরাটদের সঙ্গে সমান স্তরে। করুণাযোগ্য আমি। আজীবন ভীরু, শুধুই মায়া-মমতা আমার উদ্দেশ্যে দান করা হয়েছে। নিজেকে ছাড়িয়ে একবারও উঠতে পারলাম না।

'হ্যালো, কে অরো?'

হৃৎপিণ্ডটা অরোর গলার কাছে লাফিয়ে উঠল। নন্দা বেঁচে এখনো! 'হ্যাঁ', নিজেকে অচঞ্চল শান্ত রাখতে অরো বলল, 'একটা কথা বলব, মন দিয়ে শোনো।'

কয়েক সেকেন্ডের জন্য সে থামল। তারপর ধীরে ধীরে গম্ভীর গলায় স্পষ্ট উচ্চারণে বলল, 'তোমার হজমের ওষুধ যেটা তুমি এক্ষুণি হয়তো খাবে, সেটায় বিষ মেশান আছে। আমিই মিশিয়েছি। বিষটা মারাত্মক।'

ওধারের অস্ফুট তীক্ষ্ণ বিস্ময় অরো শুনল আর দেখল সামনের লোকটা কাঠ হয়ে উঠে বিস্ফোরিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে।

জিজ্ঞাসা করবে নিশ্চয়, কেন তোমাকে মারতে চেয়েছি? অনেক কথা তাহলে বলতে হয়। এত সময় নিয়ে ফোনে এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়। শুধু বলছি, "করুণাবশতই আমি চেয়েছি। আমি তোমাকে ভালবাসি, তাই চেয়েছি যন্ত্রণাহীন মৃত্যু হোক তোমার। নন্দা এখন তুমি জীবনের চূড়োয়। ওখান থেকে অনুকম্পার, লোকলজ্জার, নিঃসহতার গর্তে পড়লে আঘাতটা জোরেই লাগবে যদি ডিভোর্স করি। আমার পক্ষে অকল্পনীয় তোমাকে কষ্টকর জীবনের দিকে ঠেলে দেয়া। আমি যে ভালবাসা চেয়েছি, নন্দা তুমি তো দিতে পারনি। কিন্তু

অন্তত ভাল স্ত্রীর পক্ষে যা যা করা উচিত, তা তুমি করেছ। আমি কৃতজ্ঞ সেজন্য। তুমি ওষুধের কৌটোটা এখুনি ফেলে দাও। এখুনি।”

অরো রিসিভার নামিয়ে রাখল।

‘আমার কাছে কোন পয়সা নেই। একটু আগেই ছিনতাই করে নিয়েছে যা কিছু ছিল।’

লোকটির বিস্ময়ের ঘোর এখনো কাটেনি। শুধু বলল, ‘এসব কথা কাকে বলছিলেন?’

অরো হেসে বলল, ‘সম্ভবত নিজেকে।’

জায়গাটা থেকে বেরিয়ে সে রাস্তায় দাঁড়াল। অদ্ভুত রকমের শান্ত আবহাওয়া এখন তার মনের মধ্যে। পৃথিবীর সঙ্গে যোগসূত্রগুলোর প্রত্যেকটি ছিঁড়ে গেছে যেন। নিজেকে ভার লাগছে তার। এখনই বোধহয় সে পারে বিরাট কোন কাজ করতে।

রাস্তা দিয়ে মন্থরভাবে হাঁটতে হাঁটতে নন্দা, চিরো এবং চিত্রার কথা সে ভাবল। তারপর ভাবল– এইবার ঠিক করতে হবে, কিভাবে নিজের সঙ্গে লড়া যায়। আমাকে জিততেই হবে। এবার নিজের কাছ থেকে নিজেকে রক্ষা করা, সাহসীর মত। মর্যাদাসহকারে।

এই ভেবে অরো রাস্তা থেকে নেমে মাঠের গাঢ় অন্ধকারের দিকে এগিয়ে গেল।

পরদিন ভোরে অরোর দেহটি খালের ধারে প্রথম খুঁজে পায় একটি কুকুর। সে কাছে এসে তার মুখ এবং দেহ শুঁকে ধীরে ধীরে চলে যায়।

For More Books Visit www.MurchOna.com

suman_ahm@yahoo.com